রাজযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্ত্তিক শুক্লা পঞ্চমী, ১৩৫১

সূচীপত্র

পাতঞ্জল যোগসূত্র

আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, ইহার মধ্যে এক একাধিক বা সকল উপায়গুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

ইহাই ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।
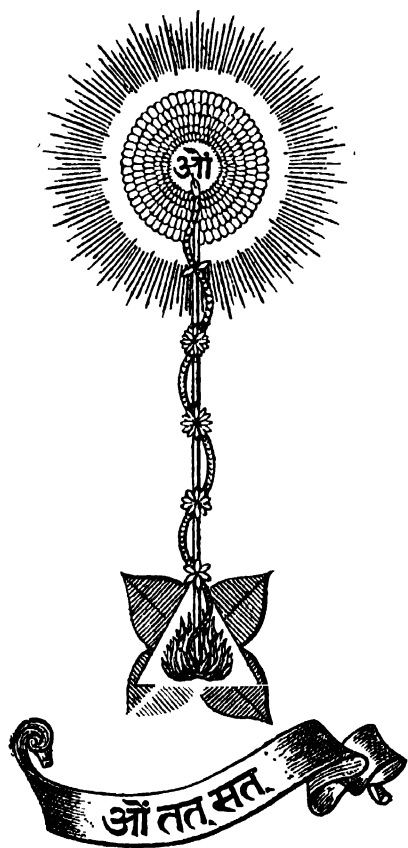
গ্রন্থকারের

ভূমিকা

ঐতিহাসিক জগতের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে অনেক অলৌকিক ঘটনার সংঘটনের বিষয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণেও যে সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্য-প্রদানকারী লোকের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ, যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক। অনেক সময়েই দেখা যায়, লোকে "যে ঘটনাগুলিকে অলৌকিক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নকল। কিন্তু কথা এই, উহারা কাহার নকল? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নহে। যে সকল বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শী নন, তাঁহারা নানাপ্রকার অলৌকিক মনো-রাজ্যের ব্যাপারপরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা পান। অতএব, ইঁহারা—যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস, মেঘপটলারূঢ় কোন পুরুষ-বিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষ তাহাদের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন, অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের

ব্যতিক্রম করেন,—তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দোষী। কারণ, ইহাদের বরং অজ্ঞতা অথবা বাল্যকালের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর (যাহা তাহাদিগকে এইরূপ অপ্রাকৃত পুরুষদিগের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়াছে ও যে নির্ভরতা এক্ষণে তাহাদের অবনত স্বভাবের একাংশস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে) দোহাই দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দোহাই দিবার কিছুই নাই।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া লোকে এইরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়াছে ও তৎপরে উহার ভিতর হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব বাহির করিয়াছে; এমন কি, মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি পর্য্যন্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাজযোগ-বিদ্যা। রাজযোগ,—আজকালকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অমার্জ্জনীয় ধারা অবলম্বনে—যে সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা দুরূহ, তাহাদিগের অস্তিত্বের অস্বীকার করে না, বরং ধীরভাবে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি, এগুলি যদিচ সত্য, কিন্তু মেঘপটলারূঢ় কোন পুরুষ অথবা পুরুষগণদ্বারা ঐ সকল ব্যাপার সংসাধিত হয়, এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা-দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। ইহা সমুদয় মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই একটি ক্ষুদ্র প্রণালী

মাত্র। ইহাতে আরও এই শিক্ষা দেয় যে, যেমন সমুদয় বাসনা ও অভাব মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, সেইরূপ তাহার অন্তরেই তাহার ঐ অভাব মোচনের শক্তিও রহিয়াছে; যখনই এবং যেখানেই কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, এই অনন্ত ভাণ্ডার হইতেই এই সমুদয় প্রার্থনাদি পরিপূর্ণ হইতেছে, উহা কোন অপ্রাকৃতিক পুরুষ হইতে নহে। অপ্রাকৃতিক পুরুষের ধারণায় মানুষের ক্রিয়াশক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতি আনয়ন করে। ইহাতে স্বাধীনতা চলিয়া যায়, ভয় ও কুসংস্কার আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। ইহা 'মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বলপ্রকৃতি' এইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে। যোগী বলেন, 'অপ্রাকৃতিক বলিয়া কিছু নাই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে।' সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সূক্ষ্ম তদ্রূপ নহে। রাজযোগ অভ্যাস দ্বারা সূক্ষ্ম অনুভূতি অর্জ্জিত হইতে থাকে।

ভারতবর্ষে যত বেদমতানুসারী দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহাদের সকলের একই লক্ষ্য—পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি। ইহার উপায় যোগ। 'যোগ' শব্দ বহুভাবব্যাপী। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই কোন না কোন আকারে যোগের সমর্থন করে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে নানাপ্রকার যোগের মধ্যে রাজযোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। পাতঞ্জলসূত্র রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্ব্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ। অন্যান্য দার্শনিকগণের কোন কোন দার্শনিক

বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও, সকলেই অবিপর্য্যয়ে তদীয় সাধনপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রথমাংশে, বর্ত্তমান লেখক নিউইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, সেইগুলি দেওয়া গেল। অপরাংশে পতঞ্জলির সূত্রগুলির ভাবানুবাদ ও তাহার সহিত একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যতদূর সাধ্য, পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করিবার ও কথোপকথনোপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমাংশে সাধনার্থিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত, নিরাপদে যোগশিক্ষা করিতে হইলে, গুরু সর্ব্বদা নিকটে থাকা আবশ্যক। যদি কথাবার্ত্তার ছলে প্রদত্ত এই সকল উপদেশ লোকের অন্তরে এই সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে গুরুর অভাব হইবে না।

পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই দুই মতে প্রভেদ অতি সামান্য। দুটি প্রধান মতবিভিন্নতা এই: প্রথমতঃ,—পতঞ্জলি আদিগুরুস্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্যেরা কেবল প্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যাঁহার উপর সাময়িক (কোন কল্পে) জগতের শাসনভার প্রদত্ত হয়, এইরূপ অর্থাৎ জন্য-ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, যোগীরা মনকে আত্মা বা পুরুষের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সাংখ্যেরা তাহা করেন না।

রাজযোগ

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

আমাদের সকল জ্ঞানই স্বানুভূতির উপর নির্ভর করে। আনুমানিক জ্ঞানের (সামান্য হইতে সামান্যতর বা সামান্য হইতে বিশেষ জ্ঞান, উভয়ের) ভিত্তি—স্বানুভূতি। সেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞান * বলে, তাহাদের সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে পারে, কারণ, উহারা প্রত্যেক লোককেই নিজে সেই বিষয় সত্য কিনা দেখিয়া তবে বিশ্বাস করিতে বলে। বিজ্ঞানবিৎ তোমাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না। তিনি নিজে কতকগুলি

* Exact Science—নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে সব বিজ্ঞানের তত্ত্ব এতদূর সঠিক ভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারা যায়। যথা—গণিত, গণিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি।

বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যখন তিনি তাঁহার সেই সিদ্ধান্তগুলিতে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন, তখন তিনি মানবসাধারণের অনুভূতির উপর উহাদের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক নিশ্চিত-বিজ্ঞানেরই (Exact Science) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, উহা হইতে যে সিদ্ধান্তসমূহ লব্ধ হয়, সকলেই ইচ্ছা করিলে উহাদের সত্যাসত্য তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, ধর্ম্মের এরূপ সাধারণ ভিত্তিভূমি কিছু আছে কিনা? ইহার উত্তর আমাকে দিতে হইলে, 'হাঁ' এবং 'না' এই উভয়ই বলিতে হইবে। জগতে ধর্ম্মসম্বন্ধে সচরাচর এইরূপ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন মতসমষ্টি মাত্র। এই কারণেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেবল বিবাদ-বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত; কেহ কেহ বলেন, মেঘপটলারূঢ় এক মহান্ পুরুষ আছেন, তিনিই সমুদয় জগৎ শাসন করিতেছেন; বক্তা আমাকে কেবল তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই উহা বিশ্বাস করিতে বলেন। এইরূপ আমারও অনেক ভাব থাকিতে পারে, আমি অপরকে তাহা বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদি তাঁহারা কোন যুক্তি চান, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে অসমর্থ হই। এই জন্যই আজকাল ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের দুর্নাম শুনা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই যেন মনের ভাব এই যে, "দূর ছাই, ধর্ম্মগুলো ত দেখছি কতকগুলো

রকমারি মত মাত্র, উহাদের সত্যাসত্য বিচারের ত একটা মানদণ্ড নেই, যাঁর যা খুশি, তিনি তাই প্রচার করতে ব্যস্ত।” কিন্তু তাঁহারা যাহাই ভাবুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মবিশ্বাসের এক সার্ব্বভৌম মূলভিত্তি আছে—উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ব্ববিধ বিভিন্ন ধারণা-সমূহের নিয়ামক। ঐগুলির মূলদেশে যাইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উহারাও সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমতঃ, আমি অনুরোধ করি যে, আপনারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসকল একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন। অল্প অনুসন্ধানেই দেখিতে পাইবেন যে, উহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলির শাস্ত্র-ভিত্তি আছে; কতকগুলির শাস্ত্র-ভিত্তি নাই। যেগুলি শাস্ত্র-ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহারা সুদৃঢ়; তদ্ধর্ম্মাবলম্বি-লোকসংখ্যাও অধিক। শাস্ত্র-ভিত্তিহীন ধর্ম্মসকল প্রায়ই লুপ্ত। কতকগুলি নূতন হইয়াছে বটে, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকেই তদনুগত। তথাপি উক্ত সকল সম্প্রদায়েই এই মতৈক্য দেখা যায় যে, তাঁহাদের শিক্ষা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অনুভব মাত্র। খ্রীষ্টিয়ান তোমাকে তাঁহার ধর্ম্মে, যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে এবং ঐ আত্মার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনীয়তায় বিশ্বাস করিতে বলিবেন। যদি আমি তাঁহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাকে বলিবেন—“ইহা আমার বিশ্বাস।” কিন্তু যদি তুমি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মূলদেশে গমন করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, উহাও প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন,

"আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি।" তাঁহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিলেন, "আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি।" এইরূপ আরও অনেক প্রত্যক্ষানুভূতি শুনা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মেও এইরূপ। বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষানুভূতির উপরে এই ধর্ম্ম স্থাপিত। তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ; তাঁহাদের শাস্ত্রে ঋষি-নামধেয় গ্রন্থকর্ত্তাগণ বলিয়া গিয়াছেন, "আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি," এবং তাঁহারা তাহাই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জগতে সমুদয় ধর্ম্মই, জ্ঞানের সার্ব্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তি যে-প্রত্যক্ষানুভব—তাহারই উপর স্থাপিত। সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আত্মদর্শন করিয়াছিলেন; সকলেই আপনাদের অনন্ত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, আর যাহা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রায় সকল ধর্ম্মেই, বিশেষতঃ ইদানীন্তন, একটি অদ্ভুত দাবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেটি এই যে— 'এক্ষণে এই সকল অনুভূতি অসম্ভব। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রথম স্থাপন-কর্ত্তা, পরে যাঁহাদের নামে সেই সেই ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, এইরূপ স্বল্প ব্যক্তিতেই কেবল, প্রত্যক্ষানুভব সম্ভব ছিল। এখন আর এরূপ অনুভব হইবার উপায় নাই; সুতরাং এক্ষণে ধর্ম্ম, বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে'—আমি এ কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার

করি। যদি জগতে কোন প্রকার বিজ্ঞানের কোন বিষয় কেহ কখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা হইতে আমরা এই সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্ব্বেও উহা কোটী কোটী বার উপলব্ধির সম্ভাবনা ছিল, পরেও অনন্তকাল ধরিয়া উহার উপলব্ধির সম্ভাবনা থাকিবে। সমবর্ত্তনই প্রকৃতির বলবৎ নিয়ম; যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে।

যোগ-বিদ্যার আচার্য্যগণ সেই নিমিত্ত বলেন, 'ধর্ম্ম যে কেবল পূর্ব্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত, তাহা নহে;—পরন্তু স্বয়ং এই সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। যে বিদ্যার দ্বারা এই সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম যোগ।' ধর্ম্মের সত্যসকল যতদিন না কেহ অনুভব করিতেছেন, ততদিন ধর্ম্মের কথা কহাই বৃথা। ভগবানের নামে গণ্ডগোল, যুদ্ধ, বাদানুবাদ কেন? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই; তাহার কারণ এই, কোন লোকই মূলে গমন করে নাই। সকলেই পূর্ব্বপুরুষগণের কতকগুলি আচারের অনুমোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা চাহিতেন, অপরেও তাহাই করুক। যাঁহার আত্মার অনুভূতি অথবা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার না হইয়াছে, তাঁহার আত্মা বা ঈশ্বর আছেন বলিবার অধিকার কি? যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা না হইলে বিশ্বাস না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল। এক দিকে, আজকালকার বিদ্বান বলিয়া পরিচিত লোকসকলের মনের ভাব

এই যে, ধর্ম্ম, দর্শন ও পরম পুরুষের অনুসন্ধান সমুদয় নিষ্ফল। অপর দিকে, যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ বোধ হয় যে—ধর্ম্ম-দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই; তবে উহাদের এই মাত্র উপযোগিতা যে, উহারা কেবল জগতের মঙ্গল-সাধনের বলবতী প্ররোচিকা শক্তি;—যদি লোকের ঈশ্বরসত্তায় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সে সৎ, নীতিপরায়ণ ও সৌজন্যশালী সামাজিক হইয়া থাকে। যাহাদের এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে ইহার জন্য দোষ দেওয়া যায় না; কারণ, তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে যা কিছু শিক্ষা পায়, তাহা কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য উন্মত্ত-প্রলাপ তুল্য অনন্ত শব্দসমষ্টিতে বিশ্বাস মাত্র। তাহাদিগকে শব্দের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বলা হয়; তাহা কি কেহ কখন পারে? যদি লোকে তাহা পারিত, তাহা হইলে আমার মানবপ্রকৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত না। মানুষ সত্য চায়, স্বয়ং সত্য অনুভব করিতে চায়, সত্যকে ধারণ করিতে চায়, সত্যকে সাক্ষাৎকার করিতে চায়, অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে চায়। বেদ বলেন, "কেবল তখনি সকল সন্দেহ চলিয়া যায়, সব তমোজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, সকল বক্রতা সরল হইয়া যায়"—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" মুণ্ডঃ উঃ ২।২।৮

"শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥" শ্বেঃ উঃ ২।৫

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" শ্বেঃ উঃ ৩।৮

হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, শ্রবণ কর—আমি এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, যিনি সমস্ত তমের অতীত, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই তথায় যাওয়া যায়—মুক্তির আর কোন উপায় নাই।

রাজযোগ-বিদ্যা এই সত্য লাভ করিবার, প্রকৃত কার্য্যকরী ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানবসমক্ষে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিদ্যারই অনুসন্ধান বা সাধন-প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তুমি যদি জ্যোতির্ব্বেত্তা হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল জ্যোতিষ জ্যোতিষ বলিয়া চীৎকার কর, জ্যোতিষশাস্ত্রে তুমি কখনই অধিকারী হইবে না। রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ, উহাতেও একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে; পরীক্ষাগারে (laboratory) গমন করিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে, উহাদিগকে একত্রিত করিতে হইবে, মাত্রা বিভাগে মিশাইতে হইবে, পরে তাহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। যদি তুমি জ্যোতির্ব্বিৎ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গমন করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তারা ও গ্রহগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে, তবেই তুমি জ্যোতির্ব্বিৎ হইতে পারিবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। আমি তোমাদিগকে শত সহস্র উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি সাধনা না কর, তোমরা

কখনই ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না; সমুদয় যুগেই, সমুদয় দেশেই, নিষ্কাম শুদ্ধ-স্বভাব সাধুগণ এই সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের, জগতের হিত ব্যতীত আর কোন কামনা ছিল না। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে—ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে যতদূর সত্য অনুভব করাইতে পারে, আমরা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি এবং তাহা পরীক্ষা করিতে আহ্বান করেন। তাঁহারা বলেন, তোমরা নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া সরল-ভাবে সাধন করিতে থাক। যদি এই উচ্চতর সত্য লাভ না কর, তাহা হইলে বলিতে পার বটে যে, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা যথার্থ নহে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই সকল উক্তির সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব আমাদের নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া যথাযথভাবে সাধন করা আবশ্যক, নিশ্চয়ই আলোক আসিবে।

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমরা সামান্যীকরণের সাহায্য লইয়া থাকি; ইহার জন্য আবার ঘটনাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। আমরা প্রথমে ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করি, পরে সেই-গুলিকে সামান্যীকৃত এবং তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা মতামতসমূহ উদ্ভাবন করি। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মনের ভিতর কি হইতেছে না হইতেছে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ততক্ষণ আমরা আমাদের মন সম্বন্ধে, মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ্য জগতের ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সহজ। প্রকৃতির প্রতি অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সহস্র সহস্র যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু

অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিবার জন্য সাহায্য করে, এমন কোনও যন্ত্র নাই। কিন্তু তথাপি আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে, কোন বিষয়ের প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিরর্থক ও নিষ্ফল হইয়া ভিত্তিহীন অনুমানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই কারণেই যে অল্প কয়েক জন মনস্তত্ত্বান্বেষী পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল কেবল বাদানুবাদ করিতেছেন মাত্র।

রাজযোগ-বিদ্যা প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই ঐ পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্র। আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবার শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত করিয়া যখন অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত করা হয়, তখনই উহা মনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবে এবং তাহার আলোকে আমাদের মনের মধ্যে কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব। মনের শক্তিসমূহ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিসদৃশ। উহারা কেন্দ্রীভূত হইলেই সমস্ত আলোকিত করে, ইহাই আমাদের সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কি বাহ্যজগতে, কি অন্তর্জগতে সকলেই এই শক্তির পরিচালনা করিতেছেন; তবে বৈজ্ঞানিক বহির্জগতে যে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনস্তত্ত্বান্বেষীকে তাহাই মনের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক অভ্যাসের আবশ্যক করে। বাল্যকাল হইতে আমরা কেবল বাহিরের বস্তুতেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, অন্তর্জগতে মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাই নাই। আর এই কারণে

আমাদের মধ্যে অনেকেই অন্তর্যন্ত্রের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মনকে অন্তর্মুখী করা, উহার বহির্মুখী গতি নিবারণ করা, যাহাতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, তজ্জন্য উহার সমুদয় শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কার্য্য। কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায়।

এইরূপ জ্ঞানের উপকারিতা কি? প্রথমতঃ, জ্ঞানই জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার। দ্বিতীয়তঃ, ইহার উপকারিতাও আছে—ইহা সমস্ত দুঃখ হরণ করিবে। যখন মানুষ আপনার মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন এক বস্তুকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, যাহার কোন কালে নাশ নাই—যাহা স্বরূপতঃ নিত্যপূর্ণ ও নিত্যশুদ্ধ, তখন তাহার দুঃখ থাকে না, নিরানন্দ থাকে না। ভয় ও অপূর্ণ বাসনা সমুদয় দুঃখের মূল। পূর্ব্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানুষ বুঝিতে পারিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন আর মৃত্যুভয় থাকিবে না। নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিতে পারিলে অসার বাসনা আর থাকে না। পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয়ের অভাব হইলেই আর কোন দুঃখ থাকিবে না। তৎপরিবর্ত্তে এই দেহেই পরমানন্দ লাভ হইবে।

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। রসায়নতত্ত্বান্বেষী নিজের পরীক্ষাগারে গিয়া, নিজের মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, তিনি যে সকল বস্তু বিশ্লেষণ করিতেছেন, তাহাদের উপর প্রয়োগ করেন এবং এইরূপে তাহাদের রহস্য অবগত হন।

জ্যোতির্ব্বিদ্ নিজের মনের সমুদয় শক্তিগুলি একত্রিত করিয়া তাহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর অমনি তারা, সূর্য্য, চন্দ্র ইহারা সকলেই আপন আপন রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি যে বিষয়ে কথা কহিতেছি, সে বিষয়ে আমি যতই মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারিব। তোমরা আমার কথা শুনিতেছ; তোমরাও যতই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, ততই আমার কথা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিবে।

মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই সকল জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত প্রদান করিতে জানিলে,—তথায় যেরূপ ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন, তাহা দিতে জানিলে—প্রকৃতি তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেন এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজঃ, একাগ্রতা হইতেই আইসে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর আইসে এবং ইহাই রহস্য।

মনকে বহির্বিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন স্বভাবতঃই বহির্মুখী; কিন্তু ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান, কিংবা দর্শন বিষয়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে প্রমেয় একটি আভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে প্রমেয়। মনস্তত্ত্ব অন্বেষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনস্তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিবার কর্ত্তা। আমরা জানি যে, মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, যদ্দ্বারা উহা নিজের ভিতরে যাহা হইতেছে, তাহা দেখিতে পারে—উহাকে অন্তঃপর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বলা যাইতে পারে। আমি তোমাদের

সহিত কথা কহিতেছি ; আবার ঐ সময়েই আমি যেন আর একজন লোক, বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং যাহা করিতেছি তাহা জানিতেছি ও শুনিতেছি। তুমি এক সময়ে কার্য্য ও চিন্তা উভয়ই করিতেছ, কিন্তু তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া, তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহা দেখিতেছে। মনের সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সূর্য্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকারময় স্থানসকলও তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যসকল প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত হইব। তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হইবে। তখনই আত্মা আছেন কি না, জীবন কেবল এই সামান্য জীবিত কালেই পর্য্যাপ্ত বা অনন্তব্যাপী এবং জগতে ঈশ্বর কেহ আছেন কি না আমরা স্বয়ং দেখিতে পাইব। সমুদয়ই আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে। রাজযোগ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর। ইহাতে যত উপদেশ আছে, তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ মনের একাগ্রতা-সাধন, তৎপরে উহার গভীরতম প্রদেশে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইতেছে, তাহার জ্ঞানলাভ, তৎপরে ঐগুলি হইতে সাধারণ সত্যসকল নিষ্কাশন করিয়া তাহা হইতে নিজের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই জন্যই রাজযোগ শিক্ষা করিতে হইলে, তোমার ধর্ম্ম যাহাই হউক—তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, য়াহুদি হও, বৌদ্ধ হও, অথবা খ্রীষ্টানই হও—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। তুমি

মানুষ—তাহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মনুষ্যেরই ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, আর তাহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, সে নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে। তবে অবশ্য ইহার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক।

এতক্ষণ দেখিলাম, এই রাজযোগ-সাধনে কোন প্রকার বিশ্বাসের আবশ্যক করে না। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পার, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না, রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেয়। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কোন সহায়তার আবশ্যক করে না। তোমরা কি বলিতে চাও যে, জাগ্রত অবস্থার সত্যতা প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার সহায়তার আবশ্যক হয়? কখনই নহে। এই রাজযোগ-সাধনে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই অভ্যাসের কিয়দংশ শরীর-সংযম-বিষয়ক। কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক। আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ মাত্র, আর মন শরীরের উপর কার্য্য করে—এ সত্যে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরও মনের উপর কার্য্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মন অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ ও সতেজ থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়, তখন তাহার মন অস্থির হয়। মনের অস্থিরতা হেতু শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হইয়া পড়ে। অধিকাংশ

লোকেরই মন শরীরের সম্পূর্ণ অধীন। বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাদের মনঃশক্তি অতি অল্পপরিমাণেই প্রস্ফুটিত। তোমরা যদি কিছু মনে না কর, তবে বলি, অধিকাংশ মনুষ্যই পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। কারণ, অনেক স্থলে সামান্য পশুপক্ষী অপেক্ষা তাহাদের সংযমের শক্তি বড় অধিক নহে। আমাদের মনকে নিগ্রহ করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে। মনের উপর এই ক্ষমতালাভের জন্য, শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের—দৈহিক সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবে, তখন মনকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সময় আসিবে। এইরূপে মন যখন আমাদের অনেকটা বশে আসিবে, তখন আমরা ইচ্ছামত উহাকে কাজ করাইতে ও ইচ্ছামত উহার বৃত্তিসমূহকে একমুখী হইতে বাধ্য করিতে পারিব।

রাজযোগীর মতে এই সমুদয় বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ বা সূক্ষ্ম-জগতের স্থূল বিকাশ মাত্র। সর্ব্বস্থলেই সূক্ষ্মকে কারণ ও স্থূলকে কার্য্য বুঝিতে হইবে। এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য্য ও অন্তর্জগৎ কারণ। এই হিসাবেই স্থূল জগতে পরিদৃশ্যমান শক্তিগুলি আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূলভাগ মাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করিয়া উহাদিগকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন, তিনি সমুদয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন। যোগী সমুদয় জগৎকে বশীভূত করা ও সমুদয় প্রকৃতির উপর ক্ষমতা বিস্তার করা রূপ সুবৃহৎ কার্য্যকে আপন কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় যাইতে চাহেন,—যথায় আমরা যাহাদিগকে "প্রকৃতির নিয়মাবলি" বলি, তাহারা তাঁহার

উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না—যে অবস্থায় তিনি ঐ সমুদয় অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সমুদয় প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতা, এই প্রকৃতিকে বশীভূত করার শক্তির উপর নির্ভর করে।

এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন একই সমাজের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি বাহ্যপ্রকৃতি, কতকগুলি আবার অন্তঃ-প্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি বাহ্য ও কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে, অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিলেই সমুদয় বশীভূত হইতে পারে; কাহারও মতে বা বাহ্য-প্রকৃতি বশীভূত করিলেই সমুদয় বশীভূত হইতে পারে। এই দুইটি সিদ্ধান্তের চরমভাব লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য; কারণ প্রকৃতপক্ষে বাহ্য, অভ্যন্তর বলিয়া কোন ভেদ নাই। ইহা একটি কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। এইরূপ বিভাগের অস্তিত্বই নাই, কখনও ছিল না। বহির্ব্বাদী বা অন্তর্ব্বাদী উভয়ে যখন স্ব স্ব জ্ঞানের চরম সীমা লাভ করিবেন, তখন একস্থানে উপনীত হইবেনই হইবেন। যেমন বহির্বিজ্ঞান-বাদী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া যাইলে শেষকালে তাঁহাকে দার্শনিক হইতে হয়, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, তিনি মন ও ভূত বলিয়া যে দুইটি ভেদ করেন, তাহা বাস্তবিক কাল্পনিক মাত্র, তাহা একদিন একেবারেই চলিয়া যাইবে।

যাহা হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয় বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। রাজযোগীরা বলেন, 'আমরা প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, পরে উহার দ্বারাই বাহ্য ও আন্তর উভয় প্রকৃতিই বশীভূত করিব।' প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়; তবে অন্যান্য জাতিরাও এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে লোকে ইহাকে রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা ভাবিত, যাঁহারা ইহা অভ্যাস করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে ডাইন, ঐন্দ্রজালিক ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোড়াইয়া অথবা অন্যরূপে মারিয়া ফেলা হইত। ভারতবর্ষে নানা কারণে ইহা এমন লোকসমূহের হস্তে পড়ে, যাহারা এই বিদ্যার শতকরা নব্বই অংশ নষ্ট করিয়া অবশিষ্টটুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট গুরুনামধারী কতকগুলি ব্যক্তিকে দেখা যাইতেছে; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, এই আধুনিক গুরুগণ কিছুই জানেন না।

এই সমস্ত যোগ-প্রণালীতে গুহ্য বা অদ্ভুত যাহা কিছু আছে সমুদয় ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা কিছু বল প্রদান করে, তাহাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন, ধর্মেও তদ্রূপ। যাহা তোমাকে দুর্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাজ্য। রহস্যস্পৃহাই মানবমস্তিষ্ককে দুর্বল করিয়া ফেলে। এই সমস্ত গুহ্য রাখাতেই যোগশাস্ত্র প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু

বাস্তবিক ইহা একটি মহাবিজ্ঞান। চতুঃসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালী-বদ্ধ হইয়া বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে। একটি আশ্চর্য্য এই যে ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাঁহার ভ্রমও সেই পরিমাণে অধিক। লেখক যতই প্রাচীন, তিনি ততই অধিক ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। আধুনিক লেখকের মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকার রহস্যের বা আজগুবী কথা কহিয়া থাকেন। এইরূপে যাহাদের হস্তে ইহা পড়িল, তাহারা সমস্ত ক্ষমতা নিজকরতলস্থ রাখিবার ইচ্ছায় ইহাকে মহা গোপনীয় বা আজগুবী করিয়া তুলিল এবং যুক্তিরূপ প্রভাকরের পূর্ণালোক আর ইহাতে পড়িতে দিল না।

আমি প্রথমেই বলিতে চাই, আমি যাহা প্রচার করিতেছি, তাহার ভিতর গুহ্য কিছুই নাই। যাহা যৎকিঞ্চিৎ আমি জানি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। ইহা যতদূর যুক্তি দ্বারা বুঝান যাইতে পারে, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি যাহা বুঝিতে পারি না, তৎসম্বন্ধে বলিব, "শাস্ত্র এই কথা বলেন।" অবিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের বিচারশক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে; কার্য্যে করিয়া দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কি-না। জড়বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যে ভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতেই এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে গোপন করিবার কোন কথা নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই; ইহার মধ্যে যতদূর সত্য আছে, তাহা সকলের সমক্ষে রাজপথে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা উচিত। কোনরূপে এ সকল গোপন করিবার চেষ্টা করিলে অনেক বিপদের উৎপত্তি হয়।

আর অধিক বলিবার পূর্ব্বে আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই সাংখ্যদর্শনের উপর রাজযোগ-বিদ্যা সংস্থাপিত। সাংখ্য দর্শনের মতে বিষয়-জ্ঞানের প্রণালী এইরূপ—প্রথমতঃ, বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিকট উহা প্রেরণ করে; ইন্দ্রিয়গণ মনের ও মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন; পুরুষ আবার, যে সকল সোপানপরম্পরায় উহা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া যেন উহাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। এইরূপে বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে। পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি জড়। তবে মন চক্ষুরাদি বাহ্য যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্ম্মিত। মন যে উপাদানে নির্ম্মিত তাহা ক্রমশঃ স্থূলতর হইলে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। উহা আরও স্থূল হইলে পরিদৃশ্যমান ভূতের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান এই। সুতরাং, বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার হস্তে যন্ত্রবিশেষ। উহা দ্বারা আত্মা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন সদা পরিবর্ত্তনশীল, একদিক হইতে অন্য দিকে দৌড়ায়, কখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিতে সংলগ্ন, কখন বা একটিতে সংলগ্ন থাকে, আবার কখনও বা কোন ইন্দ্রিয়েই সংলগ্ন থাকে না। মনে কর আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ করিয়া শুনিতেছি; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইব না; ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মন যদিও শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না। এইরূপ মন সমুদয় ইন্দ্রিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের

আবার অন্তর্দৃষ্টি শক্তি আছে, এই শক্তিবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি-শক্তির বিকাশ সাধন করাই যোগীর উদ্দেশ্য ; মনের সমুদয় শক্তিকে একত্র করিয়া ও ভিতরের দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। ইহাতে বিশ্বাসের কোন কথা নাই, ইহা কতকগুলি দার্শনিকের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের ফলমাত্র। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, চক্ষু প্রকৃতপক্ষে দর্শনের করণ নহে, ঐ করণ মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ু-কেন্দ্রে অবস্থিত। সমুদয় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন—মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্ম্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্ম্মিত। সাংখ্যেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন ; তবে প্রভেদ এই যে—সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়া আর বৈজ্ঞানিকের ভৌতিক দিক দিয়া। তাহা হইলেও, উভয়ই এক কথা। আমাদিগকে ইহার অতীত রাজ্যের অন্বেষণ করিতে হইবে।

যোগীর চেষ্টা, নিজেকে এমন সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন করা, যাহাতে তিনি বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। মানসিক প্রক্রিয়া সমুদয়ের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মানস প্রত্যক্ষ আবশ্যক। বিষয়সমূহ চক্ষুর্গোলকাদিকে আঘাত করিবামাত্র তদুৎপন্ন বেদনা কিরূপে তত্তৎ করণসহায়ে স্নায়ুমার্গে ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহারা আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়—এই সমুদয় ব্যাপারগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সকল বিষয় শিক্ষারই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী

আছে। যে কোন বিজ্ঞান শিক্ষা কর না কেন, প্রথমে আপনাকে উহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, পরে এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়। তাহা না করিলে উক্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ বুঝিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। রাজযোগ সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক। যাহাতে মন খুব পবিত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। যদি কোন পশু-শালায় গমন করা যায়, তাহা হইলে আহারের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। হস্তী অতি বৃহৎকায় জন্তু, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর যদি তুমি সিংহ বা ব্যাঘ্রের পিঁজরার দিকে গমন কর, দেখিতে পাইবে—তাহারা ছটফট্ করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সমুদয়গুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, আমরা ইহা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি তুমি উপবাস করিতে আরম্ভ কর, তোমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, দৈহিক শক্তিগুলির হ্রাস হইবে, কয়েকদিন পরে মানসিক শক্তিগুলিরও হ্রাস হইতে থাকিবে। প্রথমতঃ, স্মৃতিশক্তি চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে না, বিচার করা ত দূরের কথা। সেই জন্য সাধনের প্রথমাবস্থায় ভোজনের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে সাধনে বিশেষ অগ্রসর হইলে ঐ বিষয়ে ততদূর সাবধান না হইলেও চলে। যতক্ষণ গাছ ছোট থাকে ততক্ষণ উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, তাহা না হইলে পশুরা উহা খাইয়া

নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে ; কিন্তু বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না, তখন উহা সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হয়।

যোগিব্যক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরতা উভয়ই পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অন্যরূপে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। গীতাকার বলেন, যিনি আপনাকে অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না।

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥"

গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬।১৭

অতিভোজনকারী, উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্ম্মী, অথবা একেবারে নিষ্কর্ম্মা—ইহাদের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারে না।
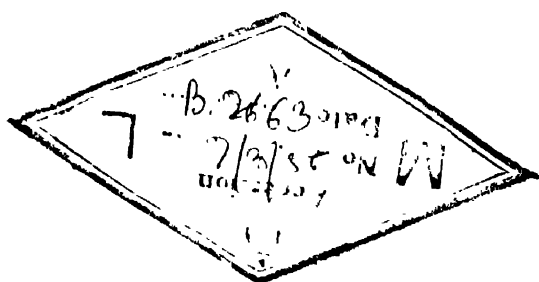
দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধনের প্রথম সোপান

রাজযোগ অষ্টাঙ্গযুক্ত। ১ম—যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। ২য়—নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। ৩য়—আসন অর্থাৎ বসিবার প্রণালী। ৪র্থ—প্রাণায়াম। ৫ম—প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি ফিরাইয়া উহাকে অন্তর্মুখী করা। ৬ঠ—ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা। ৭ম—ধ্যান। ৮ম—সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা। আমরা দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের সাধন। ইহাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ না রাখিলে কোনরূপ যোগ-সাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাঁহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদিগের অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না। যোগী কায়মনোবাক্যে কাহারও প্রতি কখনও হিংসাচরণ করিবেন না। শুদ্ধ যে মনুষ্যকে হিংসা না করিলেই হইল, তাহা নহে, অন্য প্রাণীর প্রতিও যেন হিংসা না থাকে; দয়া কেবল মনুষ্যজাতিতে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে, উহা যেন আরও অগ্রসর হইয়া সমুদয় জগৎকে আলিঙ্গন করে।

যম ও নিয়মের পর আসন। যতদিন না খুব উচ্চাবস্থা লাভ

হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মমত কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া করিতে হয়, সুতরাং দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়, এমন একটি আসন-অভ্যাসের আবশ্যক। যাঁহারা যে আসনে বসিলে সুবিধা হয়, তাঁহার সেই আসন করিয়া বসা কর্তব্য; একজনের পক্ষে একভাবে বসিয়া চিন্তা করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে হয়ত তাহা কঠিন বোধ হইবে। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, যোগ-সাধনকালে শরীরের ভিতর নানা প্রকার কার্য্য হইতে থাকিবে। স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহের গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের মধ্যে নূতন প্রকার কম্পন বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে; সমুদয় শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে; সুতরাং আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদণ্ডকে সহজভাবে রাখা আবশ্যক —ঠিক সোজা হইয়া বসিতে হইবে, আর বক্ষঃদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে—দেহের সমুদয় ভারটি যেন পঞ্জরগুলির উপর পড়ে। বক্ষঃদেশ যদি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, তাহা হইলে কোনরূপ উচ্চতত্ত্ব চিন্তা করা সম্ভব নয়, তাহা তুমি সহজেই দেখিতে পাইবে। রাজযোগের এই ভাগটি হঠযোগের সহিত অনেক মিলে। হঠযোগ কেবল স্থূলদেহ লইয়াই ব্যস্ত। ইহার উদ্দেশ্য কেবল স্থূলদেহকে সবল করা। হঠযোগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়াগুলি অতি কঠিন। উহা একদিনে শিক্ষা করিবারও যো নাই। আর উহা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না। এই সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই

ডেলসার্ট ও অন্যান্য ব্যায়ামাচার্য্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু হঠযোগের ন্যায় উহারও উদ্দেশ্য—দৈহিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজ বশে আনিতে না পারেন; হৃদয়যন্ত্র তাঁহার ইচ্ছামত বদ্ধ অথবা চালিত হইতে পারে, শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে পারেন।

মানুষ কিসে দীর্ঘজীবী হইতে পারে, ইহাই হঠযোগের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিসে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে, ইহাই হঠযোগীদিগের একমাত্র লক্ষ্য। 'আমার যেন পীড়া না হয়,' হঠযোগীর এই দৃঢ়সঙ্কল্প; এই দৃঢ়সঙ্কল্পের জন্য তাঁহার পীড়াও হয় না; তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারেন; শতবর্ষ জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা। দেড়শত বৎসর বয়স হইয়া গেলেও দেখিবে, তিনি পূর্ণ যুবা ও সতেজ রহিয়াছেন, তাঁহার একটি কেশও শুভ্র হয় নাই। কিন্তু ইহার ফল এই পর্য্যন্তই। বটবৃক্ষও কখন কখন পাঁচ হাজার বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহা যে বটবৃক্ষ সেই বটবৃক্ষই থাকে। তিনিও না হয় তদ্রূপ দীর্ঘজীবী হইলেন, তাহাতে কি ফল? তিনি না হয় খুব সুস্থকায় জীব, এইমাত্র। হঠযোগীদের দুই একটি সাধারণ উপদেশ বড় উপকারী; শিরঃপীড়া হইলে, শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকা দিয়া শীতল জল পান করিবে, তাহা হইলে সমস্ত দিনই তোমার মস্তিষ্ক অতিশয় শীতল থাকিবে, তোমার কখনই সর্দ্দি লাগিবে না। নাসিকা দিয়া জল পান করা কিছু কঠিন নয়, অতি সহজ। নাসিকা জলের ভিতর ডুবাইয়া গলায় ভিতর

জল টানিতে থাক,—ক্রমশঃ জল আপনা' আপনিই ভিতরে যাইবে।

আসন সিদ্ধ হইলে, কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। অনেকে রাজযোগের অন্তর্গত নহে বলিয়া ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। কিন্তু যখন শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ভাষ্যকার ইহার বিধান দিয়াছেন, তখন আমারও ইহা উল্লেখ করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। আমি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য হইতে এ বিষয়ে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিব* —"প্রাণায়াম দ্বারা যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্মে স্থির হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়, তবেই প্রাণায়াম করিবার শক্তি আইসে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা যথাশক্তি বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শাঙ্কর-ভাষ্য —

প্রাণায়াম-ক্ষপিত-মনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দ্দিশ্যতে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্ত্তব্যং। ততঃ প্রাণায়ামেঽধিকারঃ। দক্ষিণ-নাসিকা পুটমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পূরয়েদ্ যথাশক্তি। ততোঽনন্তরমুৎ-সৃজ্যৈবং ; দক্ষিণেন পুটেন সমুৎসৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেৎ যথাশক্তি। ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্যস্যতঃ সবনচতুষ্টয়মপররাত্রে মধ্যাহ্নে, পূর্ব্বরাত্রেঽর্দ্ধরাত্রে চ পক্ষান্মাসাদ্বিশুদ্ধির্ভবতি।

২য় অ, ৮ শ্লো।

যথাশক্তি বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন কর। অহোরাত্র চারি বার অর্থাৎ উষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও নিশীথ এই চারি সময়ে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পাঁচবার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ী-শুদ্ধি হয়; তৎপরে প্রাণায়ামে অধিকার হইবে।”

সর্ব্বদা অভ্যাস আবশ্যক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আমার কথা শুনিতে পার, কিন্তু অভ্যাস না করিলে তুমি এক বিন্দুও অগ্রসর হইতে পারিবে না। সমুদয়ই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষানুভূতি না হইলে এ সকল তত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেকগুলি বিঘ্ন আছে। ১ম ব্যাধিগ্রস্ত দেহ—শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধনের ব্যতিক্রম হইবে, এইজন্যই শরীরকে সুস্থ রাখা আবশ্যক। কিরূপ পানাহার করিয়া কিরূপে জীবন-যাপন করিব, এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক। মনে ভাবিতে হইবে, শরীর সবল হউক—এখানকার Christian Science* মতাবলম্বীরা

* Christian Science—এই সম্প্রদায় মিসেস এডিড নামক এক আমেরিকান মহিলা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার মতে জড় বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, উহা কেবল আমাদের মনের ভ্রমমাত্র। বিশ্বাস করিতে হইবে—আমাদের কোন রোগ নাই, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইব। ইহার Christian Science নাম হইবার কারণ এই যে এ মতাবলম্বীরা বলেন, “আমরা খৃষ্টের প্রকৃত পদানুসরণ করিতেছি। খৃষ্ট যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন, আমরাও তাহাতে সমর্থ ও সর্ব্বপ্রকারে দোষশূন্য জীবনযাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য।”

যেরূপ করিয়া থাকে। বাস্, শরীরের জন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই। স্বাস্থ্যরক্ষণের উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র—ইহা যেন আমরা কখনও না ভুলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য হইত, তবে ত আমরা পশুতুল্য হইতাম। পশুরা প্রায়ই অসুস্থ হয় না।

দ্বিতীয় বিঘ্ন সন্দেহ। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, সে সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকি। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া সে কখনই থাকিতে পারে না; এই কারণে যোগশাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এ সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু লোকাতীত ব্যাপার দেখিতে পাইবে ও তখন সাধনবিষয়ে তোমার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। যোগশাস্ত্রের জনৈক টীকাকার বলিয়াছেন, "যোগশাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যদি একটি খুব সামান্য প্রমাণও পাওয়া যায়, তাহাতেই সমুদয় যোগশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস হইবে।" উদাহরণস্বরূপ দেখ, কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে যে তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে; অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্ত্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়ত উহা শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এ সকল ব্যাপার অতি অল্প অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশা বাড়িবে। মনে কর, যেন তুমি নাসিকাগ্রে চিত্তসংযম করিলে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই তুমি দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ

করিতে পাইবে; তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু এইটি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই সকল সিদ্ধির আর স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, উহা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের কিঞ্চিৎ সহায় মাত্র। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য—'আত্মার মুক্তি'। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধীন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হইতে পারে না। সামান্য সিদ্ধ্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। আমরাই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিব, প্রকৃতিকে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে দিব না। শরীর বা মন কিছুই যেন আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে; আর ইহাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে—'শরীর আমার'—'আমি শরীরের নহি'।

এক দেবতা ও এক অসুর উভয়েই এক মহাপুরুষের নিকট আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন বাস করিয়া শিক্ষা করিল। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, "তুমি যাহা অন্বেষণ করিতেছ, তাহাই তুমি।" তাহারা ভাবিল, তবে দেহই 'আত্মা'। তখন তাহারা উভয়েই 'আমাদের যাহা পাইবার, তাহা পাইয়াছি' মনে করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহারা যাইয়া আপন আপন স্বজনের নিকট বলিল, "যাহা শিক্ষা করিবার তাহা সমুদয়ই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আইস ভোজন, পান,

ও আনন্দে উন্মত্ত হই—আমরাই সেই আত্মা; ইহা ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই।” সেই অসুরের স্বভাব অজ্ঞান-মেঘাবৃত ছিল, সুতরাং সে আর এ বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না। আপনাকে ঈশ্বর ভাবিয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইল; সে ‘আত্মা’ শব্দে দেহকে বুঝিল। কিন্তু দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, ‘আমি’ অর্থে এই শরীর, ইহাই ব্রহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখা, সুন্দর বসনাদি পরিধান করান ও সর্ব্বপ্রকার দৈহিক সুখ সম্ভোগ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাঁহার প্রতীতি হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ ইহা নহে যে, ‘দেহই আত্মা’, দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুরো, আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য কি এই যে, ‘শরীরই আত্মা?’ কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? সকল শরীরই ধ্বংস হইতেছে দেখিতেছি, আত্মার ত ধ্বংস নাই।” আচার্য্য বলিলেন, “তুমি স্বয়ং এ বিষয় নির্ণয় কর; তুমিই তাহা।” তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ রহিয়াছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে প্রাণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গমন করিয়া বলিলেন, “গুরো, আপনি কি প্রাণকে আত্মা বলিয়াছেন?” গুরু বলিলেন, “স্বয়ং ইহা নির্ণয় কর, তুমিই তাহা।” সেই অধ্যবসায়শীল শিষ্য পুনর্ব্বার গুরুর নিকট হইতে আসিয়া

ভাবিলেন, তবে মনই 'আত্মা' হইবে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃত্তি আবার কখন বা অসৎবৃত্তি উঠিতেছে ; মন এত পরিবর্ত্তনশীল যে, উহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "মন—আত্মা, আমার ত ইহা বোধ হয় না ; আপনি কি ইহাই উপদেশ করিয়াছেন?" গুরু বলিলেন, "না. তুমিই তাহা। তুমি নিজে উহা নির্ণয় কর।" এইবার সেই দেবপুঙ্গব আর একবার ফিরিয়া গেলেন ; তখন তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে, "আমি সমস্ত মনোবৃত্তির অতীত আত্মা, আমিই এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দাহ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জলও গলাইতে পারে না ; আমি অনাদি, জন্মরহিত, অচল, অস্পর্শ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ। 'আত্মা' শরীর বা মন নহে ; আত্মা এ সকলেরই অতীত।" এইরূপে দেবতার জ্ঞানোদয় হইল ও তিনি তজ্জনিত আনন্দে তৃপ্ত হইলেন। অসুর বেচারার কিন্তু সত্যলাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল।

এই জগতে অনেক অসুরপ্রকৃতির লোক আছেন ; কিন্তু দেবতা যে একেবারেই নাই, তাহাও নয়। যদি কেহ বলে যে, 'আইস, তোমাদিগকে এমন এক বিদ্যা শিখাইব, যাহাতে তোমাদের ইন্দ্রিয়সুখ অনন্তগুণে বর্দ্ধিত হইবে,' তাহা হইলে অগণ্য লোক তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ বলেন, 'আইস, তোমাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার বিষয়

শিখাইব,' তবে কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিবে না। উচ্চ তত্ত্ব শুধু ধারণা করিবার শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; সত্য লাভের জন্য অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্যা ত আরও বিরল। কিন্তু আবার সংসারে এমন কতকগুলি মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের ইহা নিশ্চয় ধারণা যে, শরীর সহস্র বর্ষই থাকুক বা লক্ষ বর্ষই থাকুক, চরমে সেই এক গতি। যে সকল শক্তির বলে দেহ বিধৃত রহিয়াছে, তাহারা অপসৃত হইলে দেহ থাকিবে না। কোন লোকই এক মুহূর্ত্তের জন্যও শরীরের পরিবর্ত্তন নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। 'শরীর' আর কি? উহা কতকগুলি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পরমাণু-সমষ্টি মাত্র। নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। তোমার সম্মুখে ঐ নদীতে জলরাশি দেখিতেছ; ঐ দেখ—মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা চলিয়া গেল ও নূতন আর এক জলরাশি আসিল। যে জলরাশি আসিল তাহা সম্পূর্ণ নূতন বটে, কিন্তু দেখিতে ঠিক প্রথম জলরাশির সদৃশ। শরীরও সেইরূপ ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল। শরীর এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও উহাকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা আবশ্যক, কারণ শরীরের সাহায্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই।

সর্ব্বপ্রকার শরীরের মধ্যে মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম; মানুষই শ্রেষ্ঠতম জীব। মানুষ সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে, এমন কি, দেবাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ? মানব হইতে শ্রেষ্ঠতর জীব আর নাই। দেবতাদিগকেও জ্ঞানলাভের জন্য মানবদেহ ধারণ করিতে হয়। একমাত্র মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী, দেবতারাও এ

বিষয়ে বঞ্চিত। য়াহুদি ও মুসলমানদিগের মতে ঈশ্বর, দেবতা ও অন্যান্য সমুদয় সৃষ্টির পর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া, দেবতাদিগকে গিয়া মনুষ্যকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন; ইব্লিশ ব্যতীত সকলেই তাহা করিয়াছিলেন, এই জন্যই ঈশ্বর তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে সে শয়তানরূপে পরিণত হয়। উক্ত রূপকের অভ্যন্তরে এই মহৎ সত্য নিহিত আছে যে, জগতে মানবজন্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম। পশ্বাদি তির্য্যক সৃষ্টি তমঃ-প্রধান। পশুরা কোন উচ্চতত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না। দেবগণও মনুষ্যজন্ম না লইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। দেখ, মানুষের আত্মোন্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকূল নহে, আবার একেবারে অতিশয় নিঃস্ব হইলেও উন্নতি সুদূরপরাহত হয়। জগতে যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে। মধ্যবিত্তদিগের ভিতরে সব বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় আছে।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। আমাদিগকে এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। দেখা যাউক, চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের সহিত প্রাণায়ামের কি সম্বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস যেন দেহ-যন্ত্রের গতি-নিয়ামক মূল-যন্ত্র (fly-wheel)। একটি বৃহৎ এঞ্জিনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে যে, একটি বৃহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে, সেই এঞ্জিনের অতি সূক্ষ্মতম যন্ত্রগুলি পর্য্যন্তও গতিশীল হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস সেই গতি-নিয়ামক চক্র (fly-wheel)। উহাই এই শরীরের সর্ব্বস্থানে যে কোন

প্রকার শক্তি আবশ্যক, তাহা যোগাইতেছে ও ঐ শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে।

(এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে রাজার অপ্রিয় পাত্র হওয়ায়, রাজা তাঁহাকে একটি অতি উচ্চ দুর্গের উচ্চতম প্রদেশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল; মন্ত্রীও সেই স্থানে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিব্রতা ভার্য্যা ছিলেন, তিনি রজনী-যোগে সেই দুর্গের সমীপে আসিয়া দুর্গশীর্ষস্থিত পতিকে কহিলেন, "আমি কি উপায়ে আপনার মুক্তি-সাধন করিব বলিয়া দিন।" মন্ত্রী কহিলেন, "আগামী রাত্রিতে একটি লম্বা কাছি, এক গাছি শক্ত দড়ি, এক বাণ্ডিল সূতা, খানিকটা সূক্ষ্ম রেশমের সূতা, একটা গুব্‌রে পোকা ও খানিকটা মধু আনিও।" তাঁহার সহধর্ম্মিণী পতির এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক তিনি পতির আজ্ঞানুসারে প্রার্থিত সমুদয় দ্রব্যগুলি আনয়ন করি-লেন। মন্ত্রী তাঁহাকে রেশমের সূত্রটি দৃঢ়ভাবে গুব্‌রে পোকাটিতে সংযুক্ত করিয়া দিয়া, উহার শৃঙ্গে একবিন্দু মধু মাখাইয়া দিয়া উহার মস্তক উপরে রাখিয়া, উহাকে দুর্গপ্রাচীরে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পতিব্রতা সমুদয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। তখন সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরম্ভ করিল। সম্মুখে মধুর আঘ্রাণ পাইয়া সে ঐ মধু-লোভে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল, এইরূপে সে দুর্গের শীর্ষদেশে উপনীত হইল। মন্ত্রী উহাকে ধরিলেন ও তৎসঙ্গে রেশমসূত্রটিও ধরিলেন, তৎপরে তাঁহার স্ত্রীকে রেশম-সূত্রের অপরাংশ ঐ যে আর এক বাণ্ডিল

অপেক্ষাকৃত শক্ত সূতা ছিল, তাহাতে সংযোগ করিতে আদেশ দিলেন। পরে উহাও তাঁহার হস্তগত হইলে ঐ উপায়ে তিনি দড়ি ও অবশেষে মোটা কাছিটিও পাইলেন। এখন আর বড় কিছু কঠিন কার্য্য অবশিষ্ট রহিল না। মন্ত্রী ঐ রজ্জুর সাহায্যে দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যেন রেশম-সূত্র-স্বরূপ। উহাকে ধারণ বা সংযম করিতে পারিলেই স্নায়বীয়-শক্তি-প্রবাহ-স্বরূপ (nervous currents) সূতার বাণ্ডিল, তৎপরে মনোবৃত্তিরূপ দড়ি ও পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে ধরিতে পারা যায়; প্রাণকে জয় করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।)

আমরা স্ব স্ব শরীরসম্বন্ধে অতিশয় অজ্ঞ; কিন্তু জানাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের সাধ্য এই পর্য্যন্ত যে, আমরা মৃত-দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারি; কেহ কেহ আবার জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার সহিত আমাদের নিজ শরীরের কোন সংস্রব নাই। আমরা নিজ শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আমরা মনকে ততদূর একাগ্র করিতে পারি না, যাহাতে শরীরাভ্যন্তরস্থ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতিগুলিকে ধরিতে পারি। মন যখন বাহ্য বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় ও অতি সূক্ষ্মাবস্থা লাভ করে, তখনই আমরা ঐ গতিগুলিকে জানিতে পারি। এইরূপ সূক্ষ্মানুভূতি-সম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে স্থূল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সমুদয় শরীর-

যন্ত্রকে চালাইতেছে কে? উহা যে প্রাণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসই ঐ প্রাণশক্তির প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রূপ। এখন শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাতেই আমরা দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শক্তিগুলি সম্বন্ধে জানিতে পারিব; জানিতে পারিব যে, স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলি কেমন শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। আর যখনই আমরা উহাদিগকে মনে মনে অনুভব করিতে পারিব, তখনই উহারা—ও তৎসঙ্গে দেহও—আমাদের আয়ত্ত হইবে। মনও এই সকল স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, সুতরাং উহাদিগকে জয় করিতে পারিলেই মন এবং শরীরও আমাদের অধীন হইয়া পড়ে; উহারা আমাদের দাস-স্বরূপ হইয়া পড়ে। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য; সুতরাং শরীর ও তন্মধ্যস্থ স্নায়ু-মণ্ডলীর অভ্যন্তরে যে শক্তিপ্রবাহ সর্ব্বদা চলিতেছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং আমাদিগকে প্রাণায়াম হইতেই প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে। এই প্রাণায়াম-তত্ত্বটির সবিশেষ আলোচনা অতি দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে অনেক দিন লাগিবে। আমরা ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়া আলোচনা করিব।

আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব যে, প্রাণায়াম-সাধনে যে সকল ক্রিয়া করা হয় তাহাদের হেতু কি, আর প্রত্যেক ক্রিয়ায় দেহাভ্যন্তরে কোন্ প্রকার শক্তির প্রবাহ হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই সমুদয়ই আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু ইহাতে নিরন্তর সাধনের আবশ্যক। সাধনের দ্বারাই আমার কথার সত্যতার

প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আমি এ বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ করি না কেন, কিছুই তোমাদের উপাদেয় বোধ হইবে না, যত দিন না নিজেরা প্রত্যক্ষ করিবে। যখন দেহের অভ্যন্তরে এই সকল শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, তখনই সমুদয় সংশয় চলিয়া যাইবে; কিন্তু ইহা অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ কঠোর অভ্যাসের আবশ্যক। প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া অভ্যাস করিবে; আর ঐ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃ ও সায়াহ্ন। যখন রজনীর অবসান হইয়া দিবার প্রকাশ হয় ও যখন দিবাবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হয়, এই দুই সময়ে প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ করে। খুব প্রত্যুষ ও গোধূলি, এই দুইটি সময় মনঃ-স্থৈর্য্যের অনুকূল। এই দুই সময়ে শরীর যেন কতকটা শান্ত-ভাবাপন্ন হয়। এই দুই সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমাদিগকে অনেকটা সহায়তা করিবে, সুতরাং এই দুই সময়েই সাধন করা আবশ্যক। সাধন সমাপ্ত না হইলে ভোজন করিবে না, এইরূপ নিয়ম কর; এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার আলস্য নাশ করিয়া দিবে। স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আহার অকর্ত্তব্য, ভারতবর্ষে বালকেরা এইরূপই শিক্ষা পায়; সময়ে ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহাদের যতক্ষণ না স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হয় না।

তোমাদের মধ্যে যাহাদের সুবিধা আছে, তাহারা সাধনের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এই গৃহ শয়নার্থ ব্যবহার করিও না, ইহাকে পবিত্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়া এ গৃহে প্রবেশ করিও না।

এ গৃহে সর্ব্বদা পুষ্প ও হৃদয়ানন্দকারী চিত্রসকল রাখিবে; যোগীর পক্ষে উহাদের সন্নিকটে থাকা বড় উত্তম। প্রাতে ও সায়াহ্নে তথায় ধূপ, ধূনাদি প্রজ্বলিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ, ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা যেন না হয়। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই সেই গৃহটি সত্ত্বগুণে পূর্ণ হইবে; এমন কি, যখন কোন প্রকার দুঃখ অথবা সংশয় আসিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। মন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতি করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল। এখনও অনেক মন্দির ও গির্জ্জায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, লোকে ইহার উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে পবিত্র চিন্তার পরমাণু সদা স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে তাহারা যেখানে ইচ্ছা বসিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন কর। জগতে পবিত্র চিন্তার একটি স্রোত চালাইয়া দাও। মনে মনে বল, জগতে সকলেই সুখী হউন; সকলেই শান্তি লাভ করুন; সকলেই আনন্দ লাভ করুন; এইরূপে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে পবিত্র-চিন্তা-প্রবাহ প্রবাহিত কর। এইরূপ যতই করিবে, ততই তুমি আপনাকে ভাল বোধ করিবে। পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপর সাধারণ সুস্থ হউন, এই ভাবনাই স্বাস্থ্য-লাভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হউন, এইরূপ চিন্তাই নিজেকে সুখী করিবার সহজ উপায়। তৎপরে

যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন—অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য নহে,-জ্ঞান ও হৃদয়ে সত্য-তত্ত্বোন্মেষের জন্য প্রার্থনা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত আর সমুদয় প্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তৎপরে ভাবিতে হইবে, আমার দেহ বজ্রবৎ দৃঢ়, সবল ও সুস্থ। এই দেহই আমার মুক্তির একমাত্র সহায়। ইহা বজ্রের ন্যায় দৃঢ়ীভূত চিন্তা করিবে। মনে মনে চিন্তা কর, এই শরীরের সাহায্যে আমি এই জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব। যে দুর্ব্বল, সে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সমুদয় দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। দেহকে বল, তুমি সুবলিষ্ঠ। মনকে বল, তুমিও অনন্ত-শক্তিধর; এবং নিজের উপর খুব বিশ্বাস ও ভরসা রাখ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণ

অনেকেই বিবেচনা করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ক্রিয়াবিশেষ, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত ইহার অতি অল্প সম্বন্ধ। প্রকৃত প্রাণায়াম-সাধনে অধিকারী হইতে হইলে তাহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া তন্মধ্যে একটি উপায় মাত্র। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমুদয় জগৎ দুইটি পদার্থে নির্ম্মিত। তাহাদের মধ্যে একটির নাম আকাশ। এই আকাশ একটি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বানুস্যূত সত্তা। যে কোন বস্তুর আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশই বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই সূর্য্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়। সর্ব্বপ্রাণীব শরীর—পশুশরীর, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যে সকল রূপ আমরা দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্তু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন বস্তু আছে, সমুদয়ই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই; ইহা এত সূক্ষ্ম যে, ইহা সাধারণের অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন

আকৃতি ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকে। আবার কল্পান্তে সমুদয় কঠিন তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ—সকলই পুনর্ব্বার আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়।

কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগৎরূপে পরিণত হয়? এই প্রাণের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণও সেইরূপ জগদুৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদয়ই আকাশরূপে পরিণত হয়, আর জগতের সমুদয় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদয় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হইয়াছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বকাকর্ষণ-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহরূপে (nerve-current), চিন্তাশক্তিরূপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিকশক্তি পর্য্যন্ত সমুদয়ই প্রাণের বিকাশমাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। "যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?* এই আকাশই গতিশূন্য হইয়া অবস্থিত

* নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্—ইত্যাদি।
তম আসীৎ তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেত—ইত্যাদি। ঋগ্বেদ সংহিতা ১০ম মণ্ডল।

ছিল।” প্রাণের কোন প্রকার প্রকাশ ছিল না বটে, কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও জানিতে পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, ঐ শক্তিগুলি কল্পান্তে শান্ত ভাব ধারণ করে—অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে—পরকল্পের আদিতে উহারাই আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর কার্য্য করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে পরিদৃশ্যমান সাকার বস্তু সকল উৎপন্ন হয়; আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে, এই প্রাণও নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা ও উহাকে সংযম করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ।

এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া যায়। মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন ও উহাকে জয় করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তাঁহার আয়ত্ত না হয়? তাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র-সূর্য্য স্বস্থানচ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য্য পর্য্যন্ত তাঁহার বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার শক্তিলাভই প্রাণায়াম-সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, তাঁহারা তাঁহার আজ্ঞামাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করেন; মৃত-ব্যক্তিদিগকে আসিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আগমন

করে। প্রকৃতির সমুদয় শক্তিই তাঁহার আজ্ঞামাত্র দাসবৎ কার্য্য করে। অজ্ঞ লোকেরা যোগীর এই সকল কার্য্য-কলাপ লোকাতীত বলিয়া মনে করে। হিন্দুদিগের একটি বিশেষত্ব এই যে, উহারা যে কোন তত্ত্বের আলোচনা করুক না কেন অগ্রে উহার ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান করে, উহার মধ্যে যা কিছু বিশেষ আছে তাহা পরে মীমাংসার জন্য রাখিয়া দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?" (মুঃ উঃ ১।৩)। এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে সমুদয় জানা যায়? এইরূপ, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, যত দর্শন আছে, সমুদয় কেবল যে বস্তুকে জানিলে সমুদয়ই জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। যদি কোন লোক জগতের তত্ত্ব একটু একটু করিয়া জানিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার ত অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাহাকে অবশ্য এক এক কণা বালুকাকে পর্য্যন্ত পৃথক্ ভাবে জানিতে হইবে। তবেই দেখা গেল যে, এইরূপে সমুদয় জানা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এরূপভাবে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কোথায়? এক এক বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া মানুষের সর্ব্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগীরা বলেন, 'এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ সত্তা রহিয়াছে। উহাকে ধরিতে বা জানিতে পারিলেই সমুদয় জানিতে পারা যায়।' এই ভাবেই বেদে সমুদয় জগৎকে এক সত্তা-সামান্যে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। যিনি এই 'অস্তি'-স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমুদয় জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত প্রণালীতেই সমুদয়

শক্তিকে এক প্রাণরূপ সামান্য শক্তিতে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। সুতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে যত কিছু ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে সমুদয়কেই ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ আপনার মন নহে,' সকলের মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্যান্য যত দেহ আছে, সকলকেই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদয় শক্তির মূল।

কি করিয়া এই প্রাণ জয় হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই এই এক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধনার্থী ব্যক্তিরই নিজের অত্যন্ত সমীপস্থ যাহা, তাহা হইতেই সাধন আরম্ভ করা উচিত, তাঁহার সমীপস্থ যাহা কিছু সমস্তই জয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। জগতের সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত, আবার মন তাহা অপেক্ষাও সন্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহার যে অংশটুকু এই শরীর ও মনকে চালাইতেছে, সেই প্রাণটুকু আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত। এই যে ক্ষুদ্র প্রাণতরঙ্গ—যাহা আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণসমুদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তরঙ্গ। যদি আমরা এই ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জয় করিতে পারি, তবে আমরা সমুদয় প্রাণ-সমুদ্রকে জয় করিবার আশা করিতে পারি। যে যোগী এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তখন আর কোন শক্তিই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তিনি একরূপ সর্ব্বশক্তি-মান ও সর্ব্বজ্ঞ হন। আমরা সকল দেশেই এরূপ সম্প্রদায়সকল

দেখিতে পাই, যাঁহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই দেশেই (আমেরিকায়) আমরা মনঃ-শক্তি দ্বারা আরোগ্যকারী (mind-healer), বিশ্বাসে আরোগ্যকারী (faith-healer), প্রেত-তত্ত্ববিৎ (spiritualist), খ্রীষ্টবিজ্ঞানবিৎ (Christian-scientists) * বশীকরণবিদ্যাবিৎ (hypnotists) প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে পাইতেছি। যদি আমরা এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এই মতগুলিরই মূলে—তাহারা জানুক বা নাই জানুক—প্রাণায়াম রহিয়াছে। তাহাদের সমুদয় মতগুলির মূলে একই জিনিস রহিয়াছে। তাহারা সকলেই এক শক্তি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে; তবে তাহার বিষয় তাহারা কিছুই জানে না, এইমাত্র। তাহারা দৈবক্রমে যেন একটি শক্তি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞ হইলেও, যোগী যে শক্তির পরিচালনা করিয়া থাকেন, ইহারাও না জানিয়া তাহারই পরিচালনা করিতেছে। উহা প্রাণেরই শক্তি।

এই প্রাণই সমুদয় প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে রহিয়াছে। মনোবৃত্তি ইহার সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি; যাহাকে আমরা সচরাচর মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, মনোবৃত্তি বলিতে কেবল তাহাকে বুঝায় না। মনোবৃত্তির অনেক আকারভেদ আছে যাহাকে আমরা সহজাত-জ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান-বিরহিত-চিত্তবৃত্তি বলি, তাহা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য্যক্ষেত্র।

* ২৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখ।

আমাকে একটি মশক দংশন করিল; আমার হাত আপনা আপনি উহাকে আঘাত করিতে গেল। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে আমাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ এক প্রকারের মনোবৃত্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহায্য-বিরহিত-প্রতিক্রিয়াগুলিই (Reflex-action *) এই শ্রেণীর মনোবৃত্তির অন্তর্গত। ইহা হইতে উচ্চতর আর এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি আছে, উহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক বা সজ্ঞান মনোবৃত্তি (Conscious) বলা যাইতে পারে। আমি যুক্তিতর্ক করি, বিচার করি, চিন্তা করি, সকল বিষয়ের দুইদিক্ আলোচনা করি। কিন্তু ইহাতেই সমুদয় মনোবৃত্তি ফুরাইল না! আমরা জানি, যুক্তিবিচার অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বিচরণ করে। উহা আমাদিগকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, তাহার উপর উহার আর অধিকার নাই। যে স্থানটুকুর ভিতর উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা অতি অল্প—অতি সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাইতেছি, নানাবিধ বিষয় যাহা উহার অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও উহার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে। ধূমকেতু, সৌর জগতের অধিকারের অন্তর্ভূত না হইলেও যেমন কখন কখন উহার ভিতর আসিয়া পড়ে ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ অনেক তত্ত্ব যাহা আমাদের যুক্তির অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও উহার অধিকারের ভিতর আসিয়া পড়ে। ইহাও নিশ্চয় যে, উহারা ঐ সীমার বহির্দ্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচার-শক্তি কিন্তু ঐ সীমা ছাড়াইয়া

* বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে জ্ঞানের কোন সহায়তা না লইয়া আপনি কার্য্য করে, সেই কার্য্যকে reflex-action বলে।

যাইতে পারে না। ঐ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের কারণ অবশ্যই ঐ সীমার বহির্ভূত প্রদেশে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের বিচারযুক্তি তথায় পৌঁছাইতেই পারে না। কিন্তু যোগীরা বলেন, ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরমসীমা, তাহা কখনই হইতে পারে না। মন পূর্ব্বোক্ত দুইটি ভূমি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। সেই ভূমিকে আমরা জ্ঞানাতীত (পূর্ণ চৈতন্য) ভূমি বলিতে পারি। যখন মন, সমাধি নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরূঢ় হয়, তখন উহা যুক্তির রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায় এবং সহজাত জ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সমুদয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শক্তিগুলি যাহারা প্রাণেরই অবস্থাভেদ মাত্র, তাহারা যদি ঠিক প্রকৃতপথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা মনের উপর বিশেষভাবে কার্য্য করে। মনও তখন পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ-চৈতন্য ভূমিতে চলিয়া যায় ও তথা হইতে কার্য্য করিতে থাকে।

কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই এক অখণ্ড বস্তুরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌতিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এক অখণ্ড বস্তুই যেন নানারূপে বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তোমার সহিত সূর্য্যের কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিকের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ কেবল কথার কথা মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে

স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। ঐ টেবিলটি অনন্ত জড়রাশির এক বিন্দুস্বরূপ, আর আমি উহার অপর বিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তুই যেন এই অনন্ত জড়সাগরের আবর্ত্তস্বরূপ। আবর্ত্তগুলি আবার সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। মনে কর, কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত্ত রহিয়াছে, প্রতি আবর্ত্তে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন জলরাশি আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিয়া যাইতেছে ও নূতন জলকণাসমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। এই জগৎও এইরূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জড়রাশি মাত্র, আমরা উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তস্বরূপ। কতকগুলি ভূতসমষ্টি এই জগৎরূপ মহা আবর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুদিন ঐ আবর্ত্তে ঘুরিয়া হয়ত মানব-দেহে প্রবেশ করিল, আবার হয়ত উহা কোন তির্য্যক্‌জাতীয় প্রাণীর রূপ ধারণ করিল, আবার হয়ত কয়েক বৎসর পরে খনিজ নামে আর এক প্রকার আবর্ত্তের আকার ধারণ করিল। ক্রমাগত পরিবর্ত্তন! কোন বস্তুই স্থির নহে। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, ঐরূপ বলা কেবল কথার কথা মাত্র। এক অখণ্ড জড়-রাশি মাত্র বিরাজমান রহিয়াছে। উহার কোন বিন্দুর নাম চন্দ্র, কোন বিন্দুর নাম সূর্য্য, কোন বিন্দু মনুষ্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উদ্ভিদ্, অপর বিন্দু হয়ত কোন খনিজ পদার্থ। ইহার কোনটিই সর্ব্বদা একভাবে থাকে না, সকল বস্তুই সর্ব্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে; জড়ের একবার সংশ্লেষণ আবার বিশ্লেষণ চলিতেছে। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদয় বস্তুই 'ইথার' হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড়বস্তুর প্রতিনিধিস্বরূপ

গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের সূক্ষ্মতর স্পন্দনশীল অবস্থায় এই 'ইথারকেই' মনেরও প্রতিনিধিস্বরূপ বলা যাইতে পারে। সুতরাং সমুদয় মনোজগৎও এক অখণ্ড-স্বরূপ। যিনি নিজ মনোমধ্যে এই অতি সূক্ষ্ম কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি দেখিতে পান, সমুদয় জগৎ কেবল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টিমাত্র। কোন ঔষধের শক্তিতে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে লইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় আমরা, সূক্ষ্ম কম্পন (Subtle vibration) স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যার হাম্ফ্রি ডেভির (Sir Humphrey Davy) বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পারে। হাস্যজনক বাষ্প (Laughing gas) তাঁহাকে অভিভূত করিলে, তিনি স্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; ক্ষণেক পরে সংজ্ঞালাভ হইলে বলিলেন সমুদয় জগৎ কেবল ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের জন্য সমুদয় স্থূল-কম্পন-(gross vibration) গুলি চলিয়া গিয়া কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনগুলি, যাহাকে তিনি ভাবরাশি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন—বর্ত্তমান ছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে কেবল সূক্ষ্ম কম্পনগুলি মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট যেন এক মহা ভাবসমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত্ত।

এইরূপে আমরা অন্তর্জগতের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম, আর অবশেষে যখন আমরা বাহ্য, আন্তর, সকল জগৎ ছাড়াইয়া সেই আত্মার সমীপে যাই, তখন সেখানে এক অখণ্ড

ব্যতীত আর কিছুই নাই অনুভব করি। সর্ব্বপ্রকার গতি-সমূহের অন্তরালে সেই এক অখণ্ড সত্তা আপন মহিমায় বিরাজ করিতেছেন; এমন কি, এই পরিদৃশ্যমান গতিসমূহের মধ্যেও—শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও—এক অখণ্ড ভাব বিদ্যমান। এ সকল এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ আজ-কালকার বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াছে যে, শক্তিসমষ্টি সর্ব্বত্রই সমান। আরও ইহার মতে এই শক্তিসমষ্টি দুইরূপে অবস্থিতি করে, কখন স্তিমিত বা অব্যক্ত অবস্থায়, আবার কখন ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে। ব্যক্ত অবস্থায় উহা এই সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ করে। এইরূপে উহা অনন্তকাল ধরিয়া কখন ব্যক্ত, কখনও বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করিতেছে। এই শক্তিরূপী প্রাণের সংযমের নামই প্রাণায়াম।

এই প্রাণায়ামের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সম্বন্ধ অতি অল্পই। প্রকৃত প্রাণায়ামের অধিকারী হইবার এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া একটি উপায় মাত্র। আমরা ফুসফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। উহাতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে উপলব্ধি হয়। ফুসফুসের গতি রুদ্ধ হইলে দেহের সমুদয় ক্রিয়া একেবারে স্থগিত হইয়া যায়, শরীরের অন্যান্য যে সকল শক্তি ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারাও স্তিমিত ভাব ধারণ করে। অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এমনভাবে আপনাদিগকে শিক্ষিত করেন যে, তাঁহাদের ফুসফুসের গতি রোধ হইয়া গেলেও দেহপাত হয় না। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শ্বাস-প্রশ্বাস না লইয়া

কয়েক মাস ধরিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে বাস করিতে পারেন। তাহাতেও তাঁহাদের দেহনাশ হয় না। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে, দেহে যত গতি আছে, তাহার মধ্যে ইহাই প্রধান দৈহিক গতি। সূক্ষ্মতর শক্তির কাছে যাইতে হইলে স্থূলতর শক্তির সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর শক্তিতে গমন করিতে করিতে শেষে আমাদের চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হই। শরীরে যত প্রকার ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে ফুসফুসের ক্রিয়াই অতি সহজ প্রত্যক্ষ। উহা যেন যন্ত্রমধ্যস্থ গতিনিয়ামক চক্রস্বরূপে অপর শক্তিগুলিকে চালাইতেছে। প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ—ফুসফুসের এই গতিরোধ করা; এই গতির সহিত শ্বাসেরও অতি নিকট সম্বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস যে এই গতি উৎপাদন করিতেছে তাহা নয়, বরং উহাই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি উৎপাদন করিতেছে। এই বেগই, উত্তোলন-যন্ত্রের মত, বায়ুকে ভিতর দিকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রাণ এই ফুসফুস্‌কেই চালিত করিতেছে। এই ফুসফুসের গতি আবার বায়ুকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহা হইলেই বুঝা গেল, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নহে। যে পৈশিক-শক্তি ফুসফুস্‌কে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যে শক্তি স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া মাংসপেশী-গুলির নিকট যাইতেছে ও যাহা ফুসফুস্‌কে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাই প্রাণ; প্রাণায়ামসাধনে আমাদিগকে উহাই বশে আনিতে হইবে। যখনই প্রাণজয় হইবে, তখনই আমরা দেখিতে পাইব, শরীরের মধ্যে প্রাণের অন্যান্য সমুদয় ক্রিয়াই আমাদের আয়ত্তা-ধীনে আসিয়াছে। আমি নিজেই এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা

তাঁহাদের শরীরের সমুদয় পেশীগুলিকেই বশে আনিয়াছেন অর্থাৎ সেগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারেন। কেনই বা না পারিবেন? যদি কতকগুলি পেশী আমাদের ইচ্ছামত সঞ্চালিত হয়, তবে অন্যান্য সমস্ত পেশী ও স্নায়ুগুলিকেও আমি ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারিব না কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? এখন আমাদের এই সংযমের শক্তি লোপ পাইয়াছে, আর ঐ পেশীগুলি ইচ্ছানুগ না থাকিয়া স্বৈর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি যে, পশুদের এ শক্তি আছে। আমাদের এই শক্তির পরিচালনা নাই বলিয়াই এ শক্তি নাই। ইহাকেই পুরুষানুক্রমিক শক্তি-হ্রাস (atavism) বলা হয়।

আর ইহাও আমাদের অবিদিত নাই যে, যে শক্তি এক্ষণে অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করা যায়। খুব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী করা যাইতে পারে। এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরের প্রত্যেক অংশই যে আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা যাইতে পারে, ইহা কিছু মাত্র অসম্ভব নহে, বরং খুব সম্ভব। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তোমরা হয়ত যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে দেখিয়া থাকিবে যে, শ্বাসগ্রহণের সময় সমুদয় শরীরটিকে প্রাণের দ্বারা পূর্ণ কর, এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে প্রাণ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, শ্বাস। ইহাতে

তোমাদের সহজেই সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্বাসের দ্বারা সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে। বাস্তবিক ইহা অনুবাদকেরই দোষ। দেহের সমুদয় ভাগকে, প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনী-শক্তি দ্বারা পূর্ণ করা যাইতে পারে, আর যখনই তুমি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবে, তখনই সমগ্র শরীরটি তোমার বশে আসিবে। দেহের সমুদয় ব্যাধি, সমুদয় দুঃখ, তোমার ইচ্ছাধীন হইবে। শুদ্ধ ইহাই নহে, তুমি অপরের শরীরের উপরেও ক্ষমতা বিস্তারে কৃতকার্য্য হইবে। জগতের মধ্যে ভাল মন্দ যাহা কিছু আছে, সবই সংক্রামক। তোমার শরীরযন্ত্র, মনে কর, যেন কোন বিশেষ প্রকার সুরে বাঁধা আছে; তোমার নিকট যে ব্যক্তি থাকিবে, তাহার ভিতরও সেই সুর — সেই ভাব আসিবার উপক্রম হইবে। যদি তুমি সবল ও সুস্থকায় হও, তবে তোমার সমীপস্থিত ব্যক্তিগণের যেন একটু সুস্থ ভাব, একটু সবল ভাব আসিবে। আর তুমি যদি রুগ্ন বা দুর্ব্বল হও, তবে তোমার নিকটবর্ত্তী অপর লোকেও যেন একটু রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইতেছে, দেখিতে পাইবে। তোমার দৈহিক কম্পনটি যেন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। যখন একজন লোক অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার প্রথম চেষ্টা এই হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়া দিব। ইহাই আদিম চিকিৎসাপ্রণালী। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, একজন ব্যক্তি আর একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। খুব বলবান্ ব্যক্তি যদি কোন দুর্ব্বল লোকের নিকট সদা সর্ব্বদা বাস করে, তাহা হইলে সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে। এই বল-সঞ্চারণ-

ক্রিয়া জ্ঞাতসারেও হইতে পারে, আবার অজ্ঞাতসারেও হইতে পারে। যখন এই প্রক্রিয়া জ্ঞাতসারে কৃত হয়, তখন ইহার কার্য্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও উত্তমরূপে হইয়া থাকে। আর এক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে আরোগ্যকারী স্বয়ং খুব সুস্থকায় না হইলেও অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। এই সকল স্থলে ঐ আরোগ্যকারী ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাণজয়ী বুঝিতে হইবে। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নিজ প্রাণের মধ্যে কম্পনবিশেষ উৎপাদন করিয়া অপরের শরীরে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দেন।

অনেকস্থলে এই কার্য্যটি অতি দূরেও সংসাধিত হইয়াছে। বাস্তবিক দূরত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছেদ (break) হয়, তবে দূরত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এমন দূরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরস্পর কিছুমাত্র সম্বন্ধ, কিছুমাত্র যোগ নাই? সূর্য্য ও তুমি, ইহার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে, তুমি তাহার এক অংশ, সূর্য্য তাহার আর এক অংশ। নদীর এক দেশ ও অপর দেশে কি ক্রমবিচ্ছেদ আছে? তবে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে ত কোন যুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে না। এই সকল ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য, এই প্রাণকেই বহুদূরে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, তবে অবশ্য এমন হইতে পারে যে, এ বিষয়ে একটি ঘটনা যদি সত্য হয়, ত শত শত ঘটনা কেবল জুয়াচুরি বই আর কিছুই নহে। লোকে ইহাকে যতদূর সহজ ভাবে, ইহা ততদূর সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে

দেখা যাইবে যে, আরোগ্যকারী মানব-দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার সাহায্য লইয়া সব কার্য্য সারিতেছেন। জগতে এমন কোন রোগ নাই যে, সেই রোগাক্রান্ত হইয়া সকল লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এমন কি, বিসূচিকা মহামারীতেও যদি কিছুদিন শতকরা ৬০ জন মরে, তবে দেখা যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার কমিয়া শতকরা ৩০ হয়, পরে ২০তে দাঁড়ায়, অবশিষ্ট সকলে রোগমুক্ত হয়। এলোপ্যাথ চিকিৎসক আসিলেন, বিসূচিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা করিলেন, তাঁহাদিগের ঔষধ দিলেন। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক আসিয়া, তিনিও তাঁহার ঔষধ দিলেন, হয় ত এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিলেন। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের অধিক কৃতকার্য্য হইবার কারণ এই যে, তিনি রোগীর শরীরে কোন গোলযোগ না বাধাইয়া প্রকৃতিকে নিজের ভাবে কার্য্য করিতে দেন; আর বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারী আরও অধিক আরোগ্য করিবেনই, কারণ, তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কার্য্য করিয়া বিশ্বাসবলে রোগীর অব্যক্ত প্রাণশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া দেন।

কিন্তু বিশ্বাসবলে রোগ-আরোগ্যকারীদের সর্ব্বদাই একটি ভ্রম হইয়া থাকে, তাঁহারা মনে করেন, সাক্ষাৎ বিশ্বাসই লোককে রোগমুক্ত করে। বাস্তবিক কেবল বিশ্বাসই একমাত্র কারণ, তাহা বলা যায় না। এমন সকল রোগ আছে যাহাতে রোগী নিজে আদৌ বুঝিতে পারে না যে, তাহার সেই রোগ আছে। রোগীর নিজের নীরোগিতা সম্বন্ধে অতীব বিশ্বাসই তাহার রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, আর ইহাতে আশু মৃত্যুরই সূচনা

করে। এ সকল স্থলে কেবল বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয় না। যদি বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হইত, তাহা হইলে এই সকল রোগীও কালগ্রাসে পতিত হইত না; প্রকৃতপক্ষে এই প্রাণের শক্তিতেই তাহারা রোগমুক্ত হইয়া থাকে। কোন প্রাণজিৎ পবিত্রাত্মা পুরুষ নিজ প্রাণকে এক নির্দ্দিষ্ট কম্পনে লইয়া গিয়া অপরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে সেই প্রকারের কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন। তোমরা প্রতিদিনের ঘটনা হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাইতে পার। আমি বক্তৃতা দিতেছি, বক্তৃতা দিবার সময় আমি করিতেছি কি? আমি আমার মনের ভিতর যেন এক প্রকার কম্পন উৎপাদন করিতেছি, আর আমি এই বিষয়ে যতই কৃতকার্য্য হইব, তোমরা ততই আমার বাক্যে মুগ্ধ হইবে। তোমরা সকলেই জান, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব মাতিয়া উঠি, সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের অতিশয় ভাল লাগে, আর আমার উত্তেজনা অল্প হইলে তোমাদেরও আমার বক্তৃতা শুনিতে তত আকর্ষণ হয় না।

জগৎ আলোড়নকারী তীব্র ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজ প্রাণের মধ্যে খুব উচ্চ কম্পন উৎপাদিত করিয়া ঐ প্রাণের বেগ এত অধিক ও শক্তিসম্পন্ন করিতে পারেন যে, উহা অপরকে মুহূর্ত্তমধ্যে আক্রমণ করে, সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় ও জগতের অর্দ্ধেক লোক তাঁহাদের ভাবানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। জগতে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন, সকলেই প্রাণজিৎ ছিলেন। এই প্রাণসংযমের বলে তাঁহারা প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের

ভিতর অতিশয় উচ্চ কম্পন উৎপাদন করিতেন এবং উহাতেই তাঁহাদিগকে সমুদয় জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি দিয়াছিল। জগতে যত প্রকার তেজঃ বা শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সমুদয়ই প্রাণের সংযম হইতে উৎপন্ন হয়। মানুষে ইহার প্রকৃত তথ্য না জানিতে পারে, কিন্তু আর কোন উপায়ে ইহার ব্যাখ্যা হয় না। তোমার শরীরে এই প্রাণ কখন এক দিকে অধিক, অন্য দিকে অল্প হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রাণের অসামঞ্জস্যেই রোগের উৎপত্তি। অতিরিক্ত প্রাণটুকুকে সরাইয়া যেখানে প্রাণের অভাব হইয়াছে তথাকার অভাবটুকু পূরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক, কোথায় বা অল্প প্রাণ আছে, ইহা জানাও প্রাণায়ামের অঙ্গ। অনুভব শক্তি এতদূর সূক্ষ্ম হইবে যে, মন বুঝিতে পারিবে, পদাঙ্গুষ্ঠে অথবা হস্তস্থ অঙ্গুলিতে যতটুকু প্রাণ আবশ্যক, তাহা নাই, আর উহা ঐ প্রাণের অভাব পরিপূর্ণ করিতেও সমর্থ হইবে। এইরূপ প্রাণায়ামের নানা অঙ্গ আছে। ঐগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে। ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণের সংযম ও উহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে চালনা করাই রাজযোগের একমাত্র লক্ষ্য। যখন কেহ নিজ সমুদয় শক্তিগুলিকে সংযম করিতেছে, তখন সে নিজ দেহস্থ প্রাণকেই সংযম করিতেছে। যখন কেহ ধ্যান করে, সেও প্রাণকেই সংযম করিতেছে, বুঝিতে হইবে।

মহাসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, তথায় পর্ব্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গসমূহ রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ রহিয়াছে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ রহিয়াছে, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদও

রহিয়াছে। কিন্তু এই সমুদয়ের পশ্চাতে এক অনন্ত মহাসমুদ্র। একদিকে ঐ ক্ষুদ্র বুদ্বুদটি অনন্ত সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত, আবার সেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এইরূপ সংসারে কেহ বা মহাপুরুষ, কেহ বা ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদতুল্য সামান্য ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু সকলেই সেই অনন্ত মহাশক্তিসমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এই মহাশক্তির সহিত জীবমাত্রেরই জন্মগত সম্বন্ধ। যেখানেই জীবনী শক্তির প্রকাশ দেখিবে, সেখানেই বুঝিতে হইবে, পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র বেঙের ছাতা রহিয়াছে, উহা হয়ত এত ক্ষুদ্র ও এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা উহা দেখিতে হয়; তাহা হইতে আরম্ভ কর, দেখিবে, সেটি অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার হইতে ক্রমশঃ শক্তিসংগ্রহ করিয়া আর এক আকার ধারণ করিতেছে। কালে উহা উদ্ভিদ্‌রূপে পরিণত হইল, উহাই আবার একটি পশুর আকার ধরিল, পরে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অবশেষে উহাই ঈশ্বররূপে পরিণত হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়। কিন্তু এই সময় কি? সাধনার বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে অনেক সময়ের সংক্ষেপ হইতে পারে। যোগীরা বলেন, 'যে কার্য্যে সাধারণ চেষ্টায় অধিক সময় লাগে, তাহাই কার্য্যের বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে।' মানুষ এই জগতের শক্তিরাশি হইতে অতি অল্প অল্প করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিয়া চলিতে পারে। এমন ভাবে চলিলে একজনের দেবজন্ম লাভ করিতে হয়ত লক্ষ বৎসর লাগিল। আরও উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়ত পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিল। আবার পূর্ণ

সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিল। উন্নতির বেগ বর্দ্ধিত করিলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে। রীতিমত চেষ্টা করিলে, ছয় মাসে অথবা ছয় বর্ষের ভিতর সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন? যুক্তি দ্বারা বুঝা যায়, ইহাতে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সময় নাই। মনে কর. কোন বাষ্পীয়-যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা দিলে প্রতি ঘণ্টায় দুই মাইল করিয়া যাইতে পারে। আরও অধিক কয়লা দিলে, উহা আরও শীঘ্র যাইবে। এইরূপে যদি আমরাও তীব্র সংবেগসম্পন্ন (যোঃ সূঃ ১।২১) হই, তবে এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিব কেন? অবশ্য, সকলেই শেষে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু আমি এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এইক্ষণেই, এই শরীরেই, এই মনুষ্য-দেহেই আমি মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ হইব? এই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনি লাভ না করিব কেন?

আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, ইহাই যোগবিদ্যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যতদিন না সকল মানুষ মুক্ত হইতেছে, ততদিন অপেক্ষা করিয়া একটু একটু করিয়া অগ্রসর না হইয়া প্রকৃতির অনন্ত শক্তি-ভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে শীঘ্র মুক্তিলাভ হয় যোগীরা তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। জগতের সমুদয় মহাপুরুষ, সাধু, সিদ্ধপুরুষ—ইঁহারা কি করিয়াছেন? তাঁহারা এক জন্মেই, সময়ের সংক্ষেপ করিয়া, সাধারণ মানব কোটী কোটী জন্মে যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া মুক্ত হইবে তৎসমুদয়ই ভোগ করিয়া লইয়াছেন। এক জন্মেই তাঁহারা আপনাদের মুক্তিসাধন করিয়া লন। তাঁহারা আর কিছুই চিন্তা

করেন না। আর কিছুর জন্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলেন না। এক মুহূর্ত্ত সময়ও তাঁহাদের বৃথা যায় না। এইরূপেই তাঁহাদের মুক্তির সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে; একাগ্রতার অর্থই এই, শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সময় সংক্ষিপ্ত করা; রাজযোগ এই একগ্রতা-শক্তি-লাভ করিবার বিজ্ঞান।

এই প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্ত্বের সম্বন্ধ কি? উহাও এক প্রকার প্রাণায়াম বিশেষ। যদি এ কথা সত্য হয় যে, পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব আছে, কেবল আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, এইমাত্র, তাহা হইলে ইহাও খুব সম্ভব যে, এখানেই হয়ত শত শত লক্ষ লক্ষ আত্মা রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা দেখিতে, অনুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারিতেছি না। আমরা হয়ত সর্ব্বদাই উহাদের শরীরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছি। আর ইহাও খুব সম্ভব যে, তাহারাও আমাদিগকে দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে পারে না। এ যেন একটি বৃত্তের ভিতর আর একটি বৃত্ত, একটি জগতের ভিতর আর একটি জগৎ। যাহারা এক ভূমিতে (Plane) থাকে, তাহারাই পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায়। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট প্রাণী। আমাদের প্রাণের কম্পন অবশ্যই এক বিশেষ প্রকারের। যাহাদের প্রাণের কম্পন ঠিক আমাদের মত, তাহাদিগকেই আমরা দেখিতে পাইব। কিন্তু যদি এমন কোন প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কম্পনশীল, তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাইব না। আলোকের ঔজ্জ্বল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইলে আমরা উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চক্ষুঃ এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে,

তাহারা ঐরূপ আলোকেও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের পরমাণুগুলির কম্পন অতি মৃদু হয়, তাহা হইলেও উহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু পেচক বিড়ালাদি জন্তুগণ উহা দেখিতে পায়। আমাদের দৃষ্টি এই প্রাণ-কম্পনের প্রকার-বিশেষই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। অথবা বায়ুরাশির কথা ধর। বায়ু স্তরে স্তরে যেন সজ্জিত রহিয়াছে। এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু স্থাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী যে স্তর তাহা তদূর্দ্ধস্থ স্তর হইতে অধিক ঘন, আরও ঊর্দ্ধদেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বায়ু ক্রমশঃ তরল হইতেছে। অথবা সমুদ্রের বিষয় ধর; সমুদ্রের যতই গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে যাইবে, জলের চাপ ততই বর্দ্ধিত হইবে। যে সকল জন্তু সমুদ্রতলে বাস করে, তাহারা উপরে কথনই আসিতে পারে না। কারণ, আসিলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়।

সমুদয় জগৎকে 'ইথারের' একটি সমুদ্ররূপে চিন্তা কর। প্রাণের শক্তিতে যেন উহা স্পন্দিত হইতেছে, স্পন্দিত হইয়া যেন স্তরে স্তরে বিভিন্নরূপে অবস্থিত হইল। তাহা হইলে দেখিবে, যে স্থান হইতে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে যতদূর যাওয়া যাইতেছে, ততই যেন সেই স্পন্দন মৃদুভাবে অনুভূত হইতেছে। কেন্দ্রের নিকট স্পন্দন অতি দ্রুত। আরও মনে কর যে, এই এক এক প্রকারের স্পন্দন এক একটি স্তর। এই সমুদয় স্পন্দন-ক্ষেত্রকে একটি বৃত্তরূপে কল্পনা কর; সিদ্ধি উহার কেন্দ্রস্বরূপ; ঐ কেন্দ্র হইতে যত দূরে যাওয়া যাইবে, স্পন্দন ততই মৃদু হইয়া আসিবে। ভূত সর্ব্বাপেক্ষা বহিঃস্তর, মন তাহা হইতে নিকটবর্ত্তী

স্তর, আর আত্মা যেন কেন্দ্রস্বরূপ। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা এক স্তরে বাস করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিবে, কিন্তু তদপেক্ষা নিম্ন বা উচ্চ স্তরের জীবদিগকে চিনিতে পারিবে না। তথাপি, যেমন আমরা অণু-বীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহকারে আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র বাড়াইতে পারি, তদ্রূপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন-বিশিষ্ট করিয়া অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ তথায় কি হইতেছে জানিতে পারি। মনে কর, এই গৃহেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহারা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত। তাহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দন ও আমরা আর এক প্রকার স্পন্দনের ফলস্বরূপ। মনে কর, তাহারা অধিক স্পন্দন-বিশিষ্ট ও আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প স্পন্দনশীল। আমরাও প্রাণস্বরূপ মূলবস্তু হইতে গঠিত, তাহারাও তাহাই; সকলেই এক সমুদ্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র। তবে বিভিন্নতা কেবল স্পন্দনের। যদি মনকে এখনি অধিক স্পন্দনবিশিষ্ট করিতে পারি, তবে আমি আর এই স্তরে অবস্থিত থাকিব না, আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না; তোমরা আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে ও তাহারা আবির্ভূত হইবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জান যে, এই ব্যাপারটি সত্য। মনকে এই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট করাকেই যোগশাস্ত্রে 'সমাধি' এই একমাত্র শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর এই সমাধির নিম্ন-তর অবস্থাগুলিতেই এই অতীন্দ্রিয় প্রাণিসমূহকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাধির সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় আমাদের সত্যস্বরূপ ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন আমরা যে উপাদান হইতে এই সমুদয় বহুবিধ

জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে জানিতে পারি। 'যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সকল মৃৎপিণ্ড জানা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্ম দর্শনেই সমুদয় জগৎ জানিতে পারা যায়।'

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেততত্ত্ববিদ্যায় যেটুকু সত্য আছে, তাহাও প্রাণায়ামেরই অন্তর্ভূত। এইরূপ যখনই তোমরা দেখিবে, কোন এক দল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় বা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে এই রাজযোগই সাধন করিতেছে, প্রাণসংযমের চেষ্টা করিতেছে। যেখানে কোনরূপ অসাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেখানেই প্রাণের শক্তি বুঝিতে হইবে। এমন কি, বহির্বিজ্ঞানগুলিকে পর্যন্ত প্রাণায়ামের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। বাষ্পীয় যন্ত্রকে কে সঞ্চালিত করে? প্রাণই বাষ্পের মধ্য দিয়া উহাকে চালাইয়া থাকে। এই যে তড়িতের অত্যদ্ভুত ক্রিয়াসমূহ দেখা যাইতেছে, এগুলি প্রাণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পদার্থবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে? উহা বহিরুপায়ে প্রাণায়াম। প্রাণ যখন আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আধ্যাত্মিক উপায়েই উহাকে সংযম করা যাইতে পারে। যে প্রাণায়ামে প্রাণের স্থূলরূপগুলিকে বাহ্য উপায়ের দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে। আর যে প্রাণায়ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশগুলিকে আধ্যাত্মিক উপায়ের দ্বারা সংযমের চেষ্টা করা হয়, তাহাকেই রাজযোগ বলে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ

যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নিম্নপ্রান্তে কুণ্ডলিনীর আধার-ভূত পদ্ম অবস্থিত। যোগীরা বলেন, উহা ত্রিকোণাকার। যোগী-দিগের রূপক ভাষায় ঐস্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বিরাজমানা। যখন এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, আর যতই তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের স্তরের পর স্তর যেন খুলিয়া যাইতে থাকে; আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাকে। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক হইয়া যান এবং তাঁহার আত্মা আপন মুক্তভাব উপলব্ধি করেন। মেরু-মজ্জা যে এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, ইহা আমাদের জানা আছে। ইংরাজী ৮ (8) এই অক্ষরটিকে যদি লম্বালম্বি ভাবে (∞) লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহার দুইটি অংশ রহিয়াছে আর ঐ দুইটি অংশও মধ্যদেশে সংযুক্ত। এইরূপ অক্ষর, একটির উপর আর একটি সাজাইলে

যেরূপ দেখায়, মেরু-মজ্জা কতকটা সেইরূপ। উহার বামভাগ ইড়া, দক্ষিণ দিক পিঙ্গলা, আর যে শূন্য নালী মেরুমজ্জার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে, তাহাই সুষুম্না। মেরু-মজ্জা কটিদেশস্থ মেরু-দণ্ডাংশস্থিত কতকগুলি অস্থির পরেই শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও একটি সুসূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ বরাবর নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। সুষুম্না নালী সেখানেও অবস্থিত, তবে ঐ স্থানে খুব সূক্ষ্ম হইয়াছে মাত্র। নিম্নদিকে ঐ নালীর মুখ বন্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল (Sacral plexus) অবস্থিত। আজকালকার শারীর-বিধান শাস্ত্রের (Physiology) মতে, উহা ত্রিকোণাকৃতি। ঐ সমুদয় নাড়ীজালের কেন্দ্র মেরু-মজ্জার মধ্যে অবস্থিত; উহাদিগকেই যোগিগণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্মস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যোগীরা বলেন, সর্ব্বনিম্নে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা ঐ পদ্মগুলিকে পূর্ব্বোক্ত নাড়ীজাল (Plexus) বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আজকালকার শারীর-বিধান-শাস্ত্রের দ্বারা অতি সহজে যোগীদিগের কথার ভাব বুঝা যাইবে। আমরা জানি, আমাদের স্নায়ুমধ্যে দুই প্রকারের প্রবাহ আছে; তাহাদের একটিকে অন্তর্মুখী ও অপরটিকে বহির্মুখী, একটিকে জ্ঞানাত্মক ও অপরটিকে গত্যাত্মক, একটিকে কেন্দ্রাভিমুখী ও অপরটিকে কেন্দ্রাপসারী বলা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটি মস্তিষ্কাভিমুখে সংবাদ বহন করে, অপরটি মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়া যায়। ঐ প্রবাহগুলি কিন্তু পরিণামে মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত।

আমাদের আরও জানা উচিত যে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থ মূলাধার, মস্তকস্থ সহস্রদল-পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র এই কয়েকটির কথা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক।

এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমরা সকলেই তাড়িত ও তৎসম্পৃক্ত অন্যান্য বহুবিধ শক্তির কথা শুনিয়াছি। তাড়িত কি, তাহা কেহই জানে না, তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাড়িত এক প্রকার গতিবিশেষ। জগতে অন্যান্য নানাবিধ গতি আছে. তাড়িতের সহিত উহাদের প্রভেদ কি? মনে কর, একটি টেবিল সঞ্চালিত হইতেছে,—উহার পরমাণুগুলি বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। যদি উহাদিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাই বিদ্যুচ্ছক্তি-রূপে পরিণত হইবে। সমুদয় পরমাণুগুলি একদিকে গতিশীল হইলে, তাহাকেই বৈদ্যুতিক গতি বলে; এই গৃহে যে বায়ুরাশি রহিয়াছে, তাহার সমুদয় পরমাণুগুলিকে যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে উহা এক মহা বিদ্যুদাধার-যন্ত্র (Battery) রূপে পরিণত হইবে।

এইবার শারীর-বিধান-শাস্ত্রের একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। তাহা এই—যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্রগুলিকে নিয়মিত করে, সমুদয় স্নায়ুপ্রবাহগুলির উপরও তাহার একটু প্রভাব আছে; ঐ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডে অবস্থিত। উহা শ্বাস-প্রশ্বাসগুলিকে নিয়মিত করে এবং অন্যান্য যে সকল স্নায়ুচক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে।

এইবার আমরা প্রাণায়াম-ক্রিয়া-সাধনের কারণ বুঝিতে পারিব। প্রথমতঃ, যদি নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি উত্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে শরীরের সমুদয় পরমাণুগুলিরই একদিকে গতি হইবার উপক্রম হইবে। যখন নানাদিকগামী মন নানাদিকে না গিয়া একমুখী হইয়া একটি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন সমুদয় স্নায়ুপ্রবাহও পরিবর্তিত হইয়া এক প্রকার বিদ্যুদ্বৎ গতি প্রাপ্ত হয়। কারণ, স্নায়ুগুলির উপর তাড়িত ক্রিয়া করিলে উহাদের উভয় প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয়ের উদ্ভব হয় দেখা গিয়াছে। ইহাতেই বোধ হয় যে, যখন ইচ্ছাশক্তি স্নায়ুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন উহা বিদ্যুদ্বৎ কোন পদার্থের আকার ধারণ করে। যখন শরীরস্থ সমুদয় গতিগুলি সম্পূর্ণ একাভিমুখী হয়, তখন উহা যেন ইচ্ছা-শক্তির একটি প্রবল বিদ্যুদাধারস্বরূপ (battery) হইয়া পড়ে। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম ক্রিয়াটি এইরূপে শারীর-বিধান-শাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা শরীরের মধ্যে এক প্রকার একাভিমুখী গতি উৎপাদন করে ও শ্বাস-প্রশ্বাসকেন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া শরীরস্থ অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহায্য করে। এস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য—মূলাধারে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করা।

আমরা যাহা কিছু দেখি, কল্পনা করি অথবা যে কোন স্বপ্ন দেখি, সমুদয়ই আমাদিগকে আকাশে অনুভব করিতে হয়। এই পরিদৃশ্যমান আকাশ, যাহা সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার নাম মহাকাশ। যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন বা

অলৌকিক বস্তু-জাত দর্শন করেন, তখন তিনি উহা চিত্তাকাশে দেখিতে পান। আর যখন আমাদের অনুভূতি বিষয়শূন্য হয়, যখন আত্মা নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন, তখন উহার নাম চিদাকাশ। যখন কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন যে সকল বিষয় অনুভূত হয়, তাহা চিত্তাকাশেই হইয়া থাকে। যখন তিনি ঐ নালীর শেষ সীমা মস্তিষ্কে উপনীত হয়েন, তখন চিদাকাশে এক বিষয়শূন্য জ্ঞান অনুভূত হইয়া থাকে।

এইবার তাড়িতের উপমা আবার লওয়া যাক। আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তাড়িতপ্রবাহ একস্থান হইতে অপর স্থানে চালাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি ত তাঁহার নিজের মহা মহা শক্তি-প্রবাহ প্রেরণ করিতে কোন তারের সাহায্য লন না। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, কোন প্রবাহ চালাইবার জন্য তারের বাস্তবিক কোন আবশ্যক নাই। তবে কেবল আমরা উহার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে পারি না বলিয়াই,, আমাদের তারের আবশ্যক হয়। তাড়িতপ্রবাহ যেমন তারের সাহায্যে বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হয়, ঠিক তদ্রূপভাবে বহির্ব্বিষয় হইতে যে জ্ঞানপ্রবাহ মস্তিষ্কে অথবা মস্তিষ্ক হইতে যে কর্ম্মপ্রবাহ বহির্দ্দেশে প্রেরিত হইতেছে, তাহা স্নায়ুতন্তু-রূপ তারের সাহায্যেই হইতেছে। মেরুমজ্জামধ্যস্থ জ্ঞানাত্মক ও কর্ম্মাত্মক স্নায়ুগুচ্ছস্তম্ভই যোগিগণের ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। প্রধানতঃ ঐ নাড়ীদ্বয়ের ভিতর দিয়াই পূর্ব্বোক্ত অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তিপ্রবাহদ্বয় চলাচল করিতেছে। কিন্তু কথা হইতেছে,

এইরূপ কোন প্রকার তারতুল্য পদার্থের সাহায্য ব্যতীত মস্তিষ্ক হইতে চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন সংবাদ প্রেরণ ও নানাস্থান হইতে ঐ মস্তিষ্কেই বিভিন্ন সংবাদ গ্রহণের কার্য্য না হইবে কেন? প্রকৃতিতে ত এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যাইতেছে। যোগীরা বলেন, ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই ভৌতিক বন্ধন অতিক্রম করা যাইতে পারে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার উপায় কি? যদি মেরুদণ্ডমধ্যস্থ সুষুম্নার মধ্য দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ চালিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই এই সমস্যা মিটিয়া যাইবে। মনই এই স্নায়ুজাল নির্ম্মাণ করিয়াছে, উহাকেই ঐ জাল ছিন্ন করিয়া কোনরূপ সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া আপনার কাজ চালাইতে হইবে। তখনই সমুদয় জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জন্য সুষুম্না নাড়ীকে জয় করা আমাদের এত প্রয়োজন। যদি তুমি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া নাড়ীজালের সাহায্য ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ চালাইতে পার, তাহা হইলে এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। যোগীরা বলেন, ইহা করিতে পারা যায়।

সাধারণ লোকের ভিতরে সুষুম্না নিম্নদিকে বন্ধ; উহার দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে না। যোগীরা বলেন, এই সুষুম্নাদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তদ্দ্বারা স্নায়ুপ্রবাহ চালাইবার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। সেই সাধনে কৃতকার্য্য হইলে স্নায়ু-প্রবাহ উহার মধ্যদিয়া চালাইতে পারা যায়। বাহ্য বিষয়-স্পর্শে উৎপন্ন প্রবাহ যখন কোন কেন্দ্রে যাইয়া উপনীত হয়, তখন ঐ কেন্দ্র হইতে এক প্রতিক্রিয়া (reaction) উপস্থিত হয়। স্বৈর-কেন্দ্রগুলিতে (automatic centres) ঐ প্রতিক্রিয়ার ফল কেবল গতি; চৈতন্যময়-কেন্দ্রগুলিতে

(conscious centres) কিন্তু প্রথমে অনুভব, পরে গতি হয়। সমুদয় অনুভূতিই বহির্দ্দেশ হইতে আগত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ামাত্র। তবে স্বপ্নে অনুভূতি কিরূপে হয়? তখন ত বাহিরের কোন ক্রিয়া নাই, তবে ত বিষয়াভিঘাত-জনিত স্নায়বীয় গতিগুলি শরীরের কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটি নগর দেখিলাম। তন্নগরবাচ্য বহির্ব্বস্তুরাজির আঘাতের প্রতিঘাতেই আমাদের সেই নগরের অনুভূতি অর্থাৎ সেই নগরের বহির্ব্বস্তুনিচয় দ্বারা আমাদের অন্তর্ব্বাহী স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যে গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা মস্তিষ্কমধ্যস্থ পরমাণুগুলির ভিতর গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, অনেক দিন পরেও ঐ নগরটি আমার স্মরণ-পথে আইসে। এই স্মৃতিতেও ঠিক ঐ ব্যাপারই হইয়া থাকে, তবে মৃদুতরভাবে। কিন্তু উহা মস্তিষ্কের ভিতর যে তথাবিধ মৃদুতর কম্পন আনিয়া দেয়, তাহাই বা কোথা হইতে আইসে? উহা যে সেই আদি বিষয়াভিঘাত-জনিত, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ঐ বিষয়াভিঘাত-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শরীরের কোন না কোন স্থানে কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে এবং উহাদের অভিঘাতের ফলে স্বাপ্নিক অনুভূতিরূপ মৃদু প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব। যে কেন্দ্রে বিষয়াভিঘাত-জনিত গতিপ্রবাহের অবশিষ্টাংশ বা সংস্কার-সমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, তাহাকে মূলাধার বলে, আর ঐ কুণ্ডলীকৃত ক্রিয়াশক্তিকে কুণ্ডলিনী বলে। সম্ভবতঃ গতিশক্তিগুলির অবশিষ্টাংশও এই স্থানেই কুণ্ডলীকৃত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে;

কারণ, বাহ্য বস্তুর দীর্ঘকাল চিন্তা ও আলোচনার পর শরীরের যে স্থানে ঐ মূলাধার চক্র (সম্ভবতঃ Sacral Plexus) অবস্থিত, তাহা উষ্ণ হইতে দেখা যায়। যদি এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া জ্ঞাতসারে সুষুম্না নালীর ভিতর দিয়া এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া যায়, উহা যেমন যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হইবে। যখন কুণ্ডলিনী শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন স্নায়ুরজ্জুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন তাহাই স্বপ্ন অথবা কল্পনা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু যখন ঐ দীর্ঘকালসঞ্চিত বিপুলায়তন শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র ধ্যানের শক্তিতে সুষুম্নামার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা অতি প্রবল। তাহা স্বপ্ন বা কল্পনা-কালীন প্রতিক্রিয়া হইতে ত অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ বটেই, জাগ্রৎকালীন বিষয়জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া হইতেও অনন্তগুণে প্রবল। ইহাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আর মনের এই অবস্থায় উহা জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে বলা যায়। আবার যখন উহা সমুদয় জ্ঞানের, সমুদয় অনুভূতির কেন্দ্র-স্বরূপ মস্তিষ্কে যাইয়া উপস্থিত হয়, তখন সমুদয় মস্তিষ্ক এবং উহার অনুভবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই যেন প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে; ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রকাশ বা আত্মানুভূতি। কুণ্ডলিনী শক্তি যেমন যেমন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে যাইবে, অমনি যেন মনের এক একটা পর্দ্দা খুলিয়া যাইবে এবং তখন যোগী এই জগতের সূক্ষ্ম বা কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি করিতে থাকিবেন। তখনই কেবল আমাদের বিষয়াভিঘাত ও উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জগতের

কারণসমূহের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান হইবে, সুতরাং তখনই আমাদের সর্ব্ববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে। কারণ জানিতে পারিলেই কার্য্যের জ্ঞান নিশ্চিত আসিবেই আসিবে।

এইরূপে দেখা গেল যে, কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করাই তত্ত্ব-জ্ঞান, জ্ঞানাতীত অনুভূতি বা আত্মানুভূতির একমাত্র উপায়। কুণ্ড-লিনীকে চৈতন্য করিবার অনেক উপায় আছে। কাহারও কেবল মাত্র ভগবৎপ্রেমবলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হয়, কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কৃপায় উহা ঘটিয়া থাকে, কাহারও বা সূক্ষ্ম জ্ঞান বিচার দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইয়া থাকে। লোকে যাহাকে অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান বলিয়া থাকে, যখনই কোথাও তাহার কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ দেখা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুণ্ডলিনী শক্তি কোন মতে সুষুম্নার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। তবে এরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি না জানিয়া হঠাৎ এমন কোন সাধন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাতে তাহার অজ্ঞাতসারে কুণ্ডলিনীশক্তি কিয়ৎপরিমাণে স্বতন্ত্র হইয়া সুষুম্নায় প্রবেশ করিয়াছে। যে কোন প্রকারের উপাসনাই হউক, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতভাবে সেই একই লক্ষ্যে পঁহুছিয়া দেয়, অর্থাৎ তাহাতে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হয়। যিনি মনে করেন, আমি আমার প্রার্থনার উত্তর পাইলাম, তিনি জানেন না যে, প্রার্থনা-রূপ মনোবৃত্তি-বিশেষের দ্বারা তিনি তাঁহারই দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং মানুষ না জানিয়া যাঁহাকে নানা নামে, ভয়ে, কষ্টে উপাসনা করে, তাঁহার নিকট কি করিয়া অগ্রসর হইতে হয়

জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে প্রকৃত জীবন্ত শক্তিরূপে বিরাজমানা ও অনন্তসুখপ্রসবিনী—যোগিগণ জগতের সমক্ষে ইহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সুতরাং রাজযোগই প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞান। উহাই সমুদয় উপাসনা, সমুদয় প্রার্থনা, বিভিন্ন প্রকার সাধনপদ্ধতি ও সমুদয় অলৌকিক ঘটনার যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যাস্বরূপ।

পঞ্চম অধ্যায়

অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম

এখন আমরা প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের প্রথম অঙ্গই ফুসফুসের গতিকে আয়ত্তাধীন করা। আমাদের উদ্দেশ্য—শরীরাভ্যন্তরে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতি হইতেছে, তাহাদিগকে অনুভব করা। আমাদের মন একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, উহা ভিতরের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গতিগুলিকে মোটেই ধরিতে পারে না। আমরা উহাদিগকে অনুভব করিতে সমর্থ হইলেই উহাদিগকে জয় করিতে পারিব। এই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহগুলি শরীরের সর্ব্বত্র চলিতেছে; উহারা প্রতি পেশীতে গিয়া তাহাকে জীবনী-শক্তি দিতেছে; কিন্তু আমরা সেই প্রবাহ-গুলিকে অনুভব করিতে পারি না। যোগীরা বলেন, চেষ্টা করিলে আমরা উহাদিগকে অনুভব করিতে শিক্ষা করিতে পারি। প্রথমে ফুসফুসের গতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিছুকাল ইহা করিতে পারিলেই আমরা সূক্ষ্মতর গতিগুলিকেও বশে আনিতে পারিব।

এক্ষণে প্রাণায়ামের ক্রিয়াগুলির কথা আলোচনা করা যাউক। সরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে। শরীরকে ঠিক সোজাভাবে রাখিতে হইবে। মেরুমজ্জাটি যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত

তথাপি উহা মেরুদণ্ডে সংলগ্ন নহে। বক্র হইয়া বসিলে, উহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অতএব দেখিতে হইবে, উহা যেন স্বচ্ছন্দ-ভাবে থাকে। বক্র হইয়া বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজের ক্ষতি হয়। শরীরের তিনটি ভাগ, যথা—বক্ষোদেশ, গ্রীবা ও মস্তক, সর্ব্বদা এক রেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে। তৎপরে স্নায়ুগুলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যে স্নায়ু-কেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করে, অপরাপর স্নায়ুগুলির উপরও তাহার কতকটা প্রভাব আছে। এই জন্যই শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ তালে তালে (rhythmical) করা আবশ্যক। আমরা সচরাচর যে ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করি, তাহা শ্বাস-প্রশ্বাস নামের যোগ্যই হইতে পারে না, উহা এত অনিয়মিত। আবার স্ত্রীপুরুষের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাসের একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে।

প্রাণায়াম-সাধনের প্রথম ক্রিয়া এই:—ভিতরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর ও বাহিরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর। এইরূপ করিলে দেহযন্ত্রটির অসামঞ্জস্য-ভাব বিদূরিত হইবে। কিছুদিন ইহা অভ্যাস করিবার পর, এই শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগের সময় ওঙ্কার অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিলে ভাল হয়। ভারতের প্রাণায়ামের শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য এক, দুই, তিন, চারি এই ক্রমে গণনা না করিয়া আমরা কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই জন্যই আমি প্রাণায়ামের সময় ওঙ্কার অথবা

অন্য কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে করিবে, উহা শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আসিতেছে। এরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই ক্রমশঃ যেন সাম্যভাব অবলম্বন করিতেছে। তখনই বুঝিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই নহে। একবার এই বিশ্রান্ত অবস্থা আসিলে অতিশয় শ্রান্ত স্নায়ুগণ পর্য্যন্ত জুড়াইয়া যাইবে আর তখন বুঝিবে যে, পূর্ব্বে কখনও তুমি প্রকৃত বিশ্রামসুখ সম্ভোগ কর নাই।

এই সাধনে প্রথম ফল এই দেখিবে যে, তোমার মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। মুখের শুষ্কতা বা কঠোরতাব্যঞ্জক রেখাগুলি অন্তর্হিত হইবে। মনের শান্তি মুখে ফুটিয়া বাহির হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তোমার স্বর অতি সুন্দর হইবে। আমি এমন যোগী একটিও দেখি নাই, যাঁহার গলার স্বর কর্কশ। কয়েক মাস অভ্যাসের পরই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। এই প্রথম প্রাণায়ামের কিছুদিন অভ্যাস করিয়া প্রাণায়ামের আর একটি উচ্চতর সাধন গ্রহণ করিতে হইবে। উহা এই,—ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে ফুসফুস্ বায়ুতে পূর্ণ কর। ঐ সঙ্গে স্নায়ু-প্রবাহের উপর মনঃসংযম কর; ভাব, তুমি যেন স্নায়ুপ্রবাহটিকে মেরুমজ্জার নিম্নদেশে প্রেরণ করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তির আধারভূত মূলাধারস্থিত ত্রিকোণাকৃতি পদ্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ; তৎপরে ঐ স্নায়ুপ্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্য ঐ স্থানেই ধারণ কর। তৎপরে কল্পনা কর যে, সেই স্নায়বীয় প্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক বা পিঙ্গলার দ্বারা উপরে টানিয়া লইতেছ। পরে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ধীরে

ধীরে বাহিরে প্রক্ষেপ কর। ইহা অভ্যাস করা তোমার পক্ষে একটু কঠিন বোধ হইবে। সহজ উপায়—প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বদ্ধ করিয়া বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ কর। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা উভয় নাসিকা বদ্ধ কর ও মনে কর, যেন তুমি স্নায়ুপ্রবাহটিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করিতেছ ও সুষুম্নার মূলদেশে আঘাত করিতেছ, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। তৎপরে বাম নাসিকা তর্জ্জনী দ্বারা বন্ধ রাখিয়াই দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা ধীরে ধীরে পূরণ কর ও পুনরায় পূর্ব্বের মত উভয় নাসারন্ধ্রই বন্ধ কর। (হিন্দুদিগের মত প্রাণায়াম অভ্যাস করা এদেশের (আমেরিকার) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ হিন্দুরা বাল্যকাল হইতেই ইহার অভ্যাস করে, তাহাদের ফুসফুস্ ইহাতে অভ্যস্ত।) এখানে চারি সেকেণ্ড সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেই ভাল হয়। (চারি সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু পূরণ কর, ষোল সেকেণ্ড বন্ধ কর ও পরে আট সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু রেচন কর। ইহাতেই একটি প্রাণায়াম হইবে) ঐ সময়ে কিন্তু মূলাধারস্থ ত্রিকোণাকার পদ্মটির উপর মন স্থির করিতে বিস্মৃত হইবে না।) এরূপ কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক সুবিধা হইবে। আর একপ্রকার (তৃতীয়) প্রাণায়াম এই, ধীরে ধীরে ভিতরে শ্বাস গ্রহণ কর, পরে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বাহিরে ধীরে ধীরে রেচন করিয়া বাহিরেই শ্বাস কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ করিয়া রাখ; সংখ্যা— পূর্ব্ব প্রাণায়ামের মত। পূর্ব্ব প্রাণায়ামের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পূর্ব্ব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, এক্ষেত্রে উহাকে বাহিরে রুদ্ধ করা হইল। এই শেষোক্ত প্রাণায়ামটি পূর্ব্বাপেক্ষা

সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা অতিরিক্ত অভ্যাস করা ভাল নহে। উহা প্রাতে চার বার ও সায়ংকালে চার বার মাত্র অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পার। ক্রমশঃ দেখিবে যে, তুমি অতি সহজেই ইহা করিতে পারিতেছ, আর ইহাতে খুব আনন্দও পাইতেছ। অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পারিতেছ, তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্যা চার হইতে ছয় বৃদ্ধি করিতে পার। অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে।

বর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়াটি কঠিনও নয়, আর উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। প্রথম ক্রিয়াটি যতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার শান্তভাব আসিবে। উহার সহিত ওঙ্কার যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, যখন তুমি অন্যকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছ, তখনও তুমি উহা অভ্যাস করিতে পারিতেছ। এই ক্রিয়ার ফলে তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই বোধ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয় ত খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইবেন। যাঁহারা দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরতা ও সুস্থতা লাভ হইবে। কিন্তু যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া সাধনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইবে ; তাঁহাদের নিকট সমগ্র প্রকৃতিই আর এক নব রূপ ধারণ করিবে, তাঁহাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে। তখন আর গ্রন্থে তোমার জ্ঞান অন্বেষণ করিতে

হইবে না, তোমার মনই তোমার নিকট অনন্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের কার্য্য করিবে। আমি পূর্ব্বেই মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি শক্তিপ্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর মেরুমজ্জার মধ্যদেশস্বরূপ সুষুম্নার কথাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে। তবে যোগীরা বলেন, সাধারণ জীবের এই সুষুম্না বদ্ধ থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের কার্য্য অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তিবহন করা, তাহা সকল প্রাণীতেই প্রকাশ থাকে।

কেবল যোগীরই এই সুষুম্না উন্মুক্ত থাকে। সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া গিয়া তাহার মধ্য দিয়া স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন চিত্তও উচ্চতর ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যাই। আমাদের মন তখন অতীন্দ্রিয়, জ্ঞানাতীত, পূর্ণ চৈতন্য ইত্যাদি নামধেয় অবস্থা লাভ করে। তখন আমরা বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলিয়া যাই, তখন আমরা এমন একস্থানে চলিয়া যাই যেখানে তর্ক পৌঁছিতে পারে না। এই সুষুম্নাকে উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে যে সকল শক্তিবহনকেন্দ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে তাহারা সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থিত। রূপক ভাষায় উহাদিগকেই পদ্ম বলে। পদ্মগুলির মধ্যে সকলের নিম্নদেশস্থটি সুষুম্নার সর্ব্ব নিম্নভাগে অবস্থিত—উহার নাম (১ম) মূলাধার, তৎপরে (২য়) স্বাধিষ্ঠান,

পরে (৩য়) মণিপুর, (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ) আজ্ঞা, সর্ব্বশেষে (৭ম) মস্তিষ্কস্থ সহস্রার বা সহস্রদলপদ্ম। ইহাদের মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের) কথা জানা আবশ্যক। সর্ব্বনিম্নদেশবর্ত্তী মূলাধার ও সর্ব্বোচ্চদেশে অবস্থিত সহস্রার। সর্ব্বনিম্নচক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান হইতে উহাকে মস্তিষ্কস্থ সর্ব্বোচ্চ চক্রে লইয়া যাইতে হইবে। যোগীরা বলেন, মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে, যাহার মস্তকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলী হয়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি যে খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে তাহা নহে, তবু তাহার কথায় লোকে মুগ্ধ হইতেছে। ওজঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে কোন কার্য্য করেন, তাহাতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়।

সকল মানুষের ভিতরেই অল্পাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ। ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে। বহির্জগতে যে শক্তি তাড়িত বা চৌম্বকশক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে পরিণত হইবে, পৈশিক শক্তিগুলিও ওজোরূপে পরিণত হইবে। যোগীরা বলেন,

মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া, কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা দমিত হইলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের শরীরস্থ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, সমুদয় কামশক্তিটিকে লইয়া ওজোধাতুতে পরিণত করেন। কামজয়ী নর-নারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই সর্ব্বদেশে ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই দেখিতে পায় যে, কামকে প্রশ্রয় দিলে সমুদয় ধর্ম্মভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজঃ—সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে যে ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই সেই সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই জন্যই বিবাহত্যাগী সন্ন্যাসিদলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণভাবে কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যশূন্য হইয়া রাজযোগসাধন বড় বিপৎ-সঙ্কুল; কারণ উহাতে শেষে মস্তিষ্কের বিষম বিকার জন্মাইতে পারে। যদি কেহ রাজযোগ অভ্যাস করে, অথচ অপবিত্র জীবন যাপন করে, সে কিরূপে যোগী হইবার আশা করিতে পারে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যাহার ও ধারণা

প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার সাধন করিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, প্রত্যাহার কি? তোমরা সকলেই জান, কিরূপে বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে দেখ, ইন্দ্রিয়দ্বারস্বরূপ বাহিরের যন্ত্রগুলি রহিয়াছে, পরে ঐ ইন্দ্রিয়গোলকের অভ্যন্তরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গুলি—ইহারা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রগুলির সহায়তায় শরীরের উপর কার্য্য করিতেছে, তৎপরে মন। যখন এই ইন্দ্রিয়গুলি একত্রিত হইয়া কোন বহির্বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল কোন একটি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখা অতি কঠিন; কারণ, মন (বিষয়ের) দাসস্বরূপ।

আমরা জগতে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, 'সাধু হও,' 'সাধু হও,' 'সাধু হও'। বোধ হয়, জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাই, যে 'মিথ্যা কহিও না', 'চুরি করিও না' ইত্যাদিরূপ শিক্ষা পায় নাই, কিন্তু কেহ তাহাকে এই সকল অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দেয় না। শুধু কথায় হয় না। কেনই বা সে চোর না হইবে? আমরা ত তাহাকে চৌর্য্যকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি, 'চুরি করিও না'। মনঃসংযম করিবার

উপায় শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহায্য করা হয়, তাহাতেই তাহার শিক্ষা ও উপকার হইয়া থাকে। যখন মন ইন্দ্রিয়-নামধেয় ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই সমুদয় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম হইয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, মানুষ নিজ মনকে ভিন্ন ভিন্ন (ইন্দ্রিয়-নামধেয়) কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্যই মানুষ নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম করে, করিয়া শেষে কষ্ট পায়। মন যদি নিজের বশে থাকিত, তবে মানুষ কখনই অন্যায় কর্ম্ম করিত না। মনঃসংযম করিবার ফল কি? ফল এই যে, মন সংযত হইয়া গেলে, সে আর তখন আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়রূপ বিষয়ানুভূতি-কেন্দ্রগুলিতে সংযুক্ত করিবে না। তাহা হইলেই সর্ব্বপ্রকার ভাব ও ইচ্ছা আমাদের বশে আসিবে। এ পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার বুঝা গেল। এক্ষণে কথা এই, ইহা কার্য্যে পরিণত করা কি সম্ভব? ইহা সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। তোমরা বর্ত্তমানকালেও ইহার কতকটা আভাস দেখিতে পাইতেছ; বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারিসম্প্রদায় দুঃখ, কষ্ট, অশুভ ইত্যাদির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিতেছেন। অবশ্য ইঁহাদের দর্শন কতকটা শিরোবেষ্টন করিয়া নাসিকা প্রদর্শনের ন্যায়। কিন্তু উহাও একরূপ যোগ, কোনরূপে উহা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। যে সকল স্থলে তাঁহারা দুঃখ-কষ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়া লোকের দুঃখ দূর করিতে কৃতকার্য্য হন, বুঝিতে হইবে, সে সকল স্থলে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহারেরই কতকটা শিক্ষা দিয়াছেন; কারণ

তাঁহারা সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয়া দেন, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়গণের কথা প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ করে না। বশীকরণ-বিদ্যাবিদ্‌গণও (hypnotists) পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সদৃশ উপায় অবলম্বনে ইঙ্গিত-বলে (আজ্ঞা, hypnotic suggestion), কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহাদের বশ্যব্যক্তিগণের ভিতরে একরূপ অস্বাভাবিক প্রত্যাহার আনয়ন করেন। যাহাকে সচরাচর বশীকরণ-ইঙ্গিত বলে, তাহা কেবল রোগ-গ্রস্ত দেহ ও মোহ-তিমিরাচ্ছন্ন মনেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশী-করণকারী যতক্ষণ না স্থিরদৃষ্টি অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহার বশ্যব্যক্তির মনকে নিষ্ক্রিয় জড়তুল্য অস্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া যাইতে পারেন, ততক্ষণ তিনি যাহাই ভাবিতে, দেখিতে বা শুনিতে আদেশ করুন না কেন, উহার কোন ফল হয় না।

বশীকরণকারী বা বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারীরা যে কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য তাঁহাদের বশ্যব্যক্তির শরীরস্থ শক্তিকেন্দ্রগুলিকে (ইন্দ্রিয়) বশীভূত করিয়া থাকেন, তাহা অতিশয় নিন্দার্হ কর্ম্ম, কারণ উহাতে ঐ বশ্যব্যক্তিকে চরমে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়। ইহা ত নিজের ইচ্ছাশক্তিবলে নিজের মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলির সংযম নয়, অপরের ইচ্ছাশক্তির হঠাৎ প্রবল আঘাতে বশ্যব্যক্তির মনকে খানিকক্ষণের জন্য যেন স্তম্ভিত করিয়া রাখা। উহা রশ্মি ও পৈশিক শক্তির সাহায্যে শকটাকর্ষক উচ্ছৃঙ্খল অশ্বগণের উন্মত্ত গতিকে সংযত করা নহে, উহা অপরকে সেই অশ্বগণের উপর তীব্র আঘাত করিতে বলিয়া উহাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করিয়া শান্ত করিয়া রাখা। সেই ব্যক্তির উপর এই প্রক্রিয়া

যতই করা হয়, ততই সে তাহার মনের শক্তির কিয়দংশ করিয়া হারাইতে থাকে, পরিশেষে মনকে সম্পূর্ণ জয় করা দূরে থাক, ক্রমশঃ তাহার মন একপ্রকার শক্তিহীন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া যায়, পরিশেষে বাতুলালয়ই তাহার চরম গতি হইয়া দাঁড়ায়।

নিজের মনকে নিজের বশে আনিবার চেষ্টার পরিবর্তে এইরূপ পরেচ্ছাপ্রণোদিত সংযমের চেষ্টায় কেবল যে অনিষ্ট হয় তাহা নহে, উহা যে উদ্দেশ্যে কৃত হয় তাহাই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক জীবাত্মারই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা স্বাধীনতা; জড়বস্তু ও চিত্তবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উহাদের প্রভুত্ব—বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব। কিন্তু উহার সহায়তা করা দূরে থাক, অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ (উহা আমার প্রতি যে আকারেই প্রযুক্ত হউক না কেন,—উহাদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হউক, অথবা উহা একরূপ পীড়িত বা বিকৃতাবস্থায় আমার ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে বাধ্য করুক) বরং আমি যে সকল চিত্তবৃত্তিরূপ বন্ধনের—যে সকল প্রাচীন কুসংস্কারের—গুরু শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহারই উপর আর একটি বন্ধনের, আর একটি কুসংস্কারের গ্রন্থি চাপাইয়া দেয়। অতএব সাবধান, অপরকে তোমার উপর যথেচ্ছ শক্তি সঞ্চালন করিতে দিও না। অথবা অপরের উপর এইরূপ ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিয়া না জানিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিও না। সত্য বটে, কেহ কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাদের কিয়ৎ পরিমাণে কল্যাণসাধনে কৃতকার্য্য হন, কিন্তু আবার অপরের উপর এই বশীকরণ-শক্তি প্রয়োগ

করিয়া, না জানিয়া যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে একরূপ বিকৃত জড়াবস্থাপন্ন করিয়া তুলেন, যাহাতে পরিণামে তাহাদের আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা হয় নাই। এই কারণেই যে কোন ব্যক্তি তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করিতে বলেন, অথবা নিজের শ্রেষ্ঠতর ইচ্ছাশক্তিবলে বশীভূত করিয়া বহু লোককে তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য করেন, তিনি ইচ্ছা করিয়া না করিলেও মনুষ্যজাতির গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

অতএব নিজ মন সংযত করিতে সর্ব্বদাই নিজ মনের সহায়তা লইবে, আর এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, তুমি যদি রোগগ্রস্ত না হও, তবে তোমার বহির্দ্দেশস্থ কোন ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর কার্য্য করিতে পারিবে না; আর যে কোন ব্যক্তি তোমায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলেন, তিনি যত বড় লোক বা যত বড় সাধুই হউন না কেন, তাঁহার সঙ্গ দূর হইতে পরিহার করিবে। জগতের সর্ব্বত্রই বহু সম্প্রদায় আছে—নৃত্য, লম্ফ-ঝম্ফ, চীৎকার যাহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। তাহারা যখন সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব যেন সংক্রামক রোগের মত লোকের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। তাহারাও এক প্রকার বশীকরণকারী। তাহারা ক্ষণকালের জন্য সহজে অভিভাব্য ব্যক্তিগণের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা বিস্তার করে। কিন্তু হায়! পরিণামে সমুদয় জাতিকে পর্য্যন্ত একেবারে অধঃ-পতিত করিয়া দেয়। এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃ-শক্তিবলে কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং

অসৎ থাকাও ভাল ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই সকল ধর্ম্মোন্মাদ ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্য ভাল বটে, কিন্তু ইহাদের কোন দায়িত্ববোধ নাই। ইহারা মনুষ্যের যে পরিমাণে অনিষ্ট করে, তাহা ভাবিতে গেলে যেন হৃদয় দমিয়া যায়। তাহারা জানে না যে, যে সকল ব্যক্তি সঙ্গীতস্তবাদির সহায়তায় তাহাদের শক্তিপ্রভাবে এইরূপ হঠাৎ ভগবদ্ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহারা কেবল আপনাদিগকে জড়, বিকৃত-ভাবাপন্ন ও শক্তিশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। ক্রমশঃ তাহাদের মন এরূপ হইয়া যাইবে যে, অতি অসৎ প্রভাব আসিলেও তাহারা তাহার অধীন হইয়া পড়িবে, উহা প্রতিবোধ করিবার তাহাদের কোন শক্তিই থাকিবে না। এই অজ্ঞ, আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিগণের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না যে, তাহারা যখন আপনাদের মনুষ্যহৃদয় পরিবর্ত্তন করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়—যে ক্ষমতা তাহারা মনে করে, মেঘপটলারূঢ় কোন পুরুষ কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে—তখন তাহারা ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মত্ততা ও মৃত্যুর বীজ বপন করিতেছে। অতএব যাহাতে তোমার স্বাধীনতা নষ্ট হয়, এমন সর্ব্বপ্রকার প্রভাব হইতে আপনাকে সাবধানে রাখিবে—উহাকে দারুণ বিপদসঙ্কুল জ্ঞানে প্রাণপণ চেষ্টায় উহা দূর হইতে পরিহার করিবে।

যিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন অথবা কেন্দ্রগুলি হইতে সরাইয়া লইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারই প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাহারের অর্থ, একদিকে আহরণ করা—মনের বহির্গতি রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা হইতে

মনকে মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ করা। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে, তবেই আমরা যথার্থ চরিত্রবান হইব; এবং তখনই আমরা মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিব; তাহা না করিতে পারিলে যন্ত্রের সহিত আমাদের প্রভেদ কি?

মনকে সংযম করা কি কঠিন! ইহাকে যে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা বড় অসঙ্গত নহে। কোন স্থানে এক বানর ছিল। তাহার মর্কট-স্বভাব-সুলভ চঞ্চলতা ত ছিলই—যেন ঐ স্বাভাবিক অস্থিরতায় কুলাইল না বলিয়া এক ব্যক্তি উহাকে অনেকটা মদ খাওয়াইয়া দিল, তাহাতে সে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর তাহাকে এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমরা অবশ্যই জান, কাহাকেও বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সারাদিনই চারিদিকে কেবল ছটফট্ করিয়া বেড়ায়। সুতরাং ঐ মত্ত অবস্থায় আবার বৃশ্চিক দংশনে বানর বেচারাটির অস্থিরতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। পরে যেন তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই এক ভূত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল। এই অবস্থায় বানরটির যে ভয়ানক চঞ্চলতা আসিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মনুষ্য-মন ঐ বানরের তুল্য। মন ত স্বভাবতঃই নিয়ত চঞ্চল, আবার উহা বাসনারূপ মদিরাতে মত্ত, ইহাতে উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন বাসনা আসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন সুখী লোকদিগকে দেখিলে ঈর্ষ্যারূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে থাকে। পরে আবার যখন অহঙ্কার-রূপ পিশাচ তাহার

ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে আপনাকেই বড় বলিয়া বোধ করে। এই আমাদের মনের অবস্থা! সুতরাং ইহাকে সংযম করা কি কঠিন!

অতএব মনঃসংযমের প্রথম সোপান এই যে, কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাক ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দাও। মন সদা চঞ্চল। উহা বানরের মত সর্ব্বদা লাফাইতেছে। মন-বানর যত ইচ্ছা লম্ফ-ঝম্ফ করুক ক্ষতি নাই, ধীরভাবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাও। কথায় বলে, জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি—ইহা অতি সত্য কথা। যতক্ষণ না মনের ক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করিতে পারিবে, ততক্ষণ উহাকে সংযম করিতে পারিবে না। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও। খুব ভয়ানক ভয়ানক বীভৎস চিন্তা হয়ত তোমার মনে আসিবে—তোমার মনে এতদূর অসৎ চিন্তা আসিতে পারে, ইহা ভাবিয়া তুমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিবে, মনের এই সকল ক্রীড়া প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে, প্রতিদিনই মন ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিতেছে। প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, তোমার মনে সহস্র সহস্র চিন্তা আসিবে, ক্রমশঃ হয়ত উহা কমিয়া গিয়া শত শত চিন্তায় পরিণত হইবে। আরও কয়েক মাস পরে উহা আরও কমিয়া আসিয়া অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে আমাদের বশে আসিবে; কিন্তু প্রতিদিনই আমাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর বাষ্প থাকিবে ততক্ষণ উহা চলিবেই চলিবে; যতদিন বিষয় আমাদের সম্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় দেখিতে হইবেই

হইবে। সুতরাং মানুষ যে এঞ্জিনের মত যন্ত্রমাত্র নহে, তাহা প্রমাণ করিতে গেলে তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, সে কিছুরই অধীন নয়। এইরূপে মনকে সংযম করা ও উহাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-গোলকে সংযুক্ত হইতে না দেওয়াই প্রত্যাহার। ইহা অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহা একদিনে হইবার নহে, অনেক দিন ধরিয়া ইহার অভ্যাস করিতে হইবে। ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত ক্রমাগত বহু বর্ষ অভ্যাস করিলে তবে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

কিছুকালের জন্য প্রত্যাহার সাধন করিবার পর তৎপরের সাধন অর্থাৎ ধারণা অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যাহারের পর ধারণা—ধারণা অর্থে মনকে দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী অথবা বহির্দ্দেশস্থ কোন দেশবিশেষে ধারণা বা স্থাপন করা। মনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধারণা করিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোন এক বিশেষ অংশ অনুভব করিবার জন্য বলপূর্ব্বক নিযুক্ত রাখা। মনে কর, যেন আমি মনকে হস্তের উপর ধারণ করিলাম, শরীরের অন্যান্য অবয়ব তখন চিন্তার অবিষয়ীভূত হইয়া পড়িল। যখন চিত্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট দেশে আবদ্ধ হয় তখন উহাকে ধারণা বলে। এই ধারণা নানাবিধ। এই ধারণা অভ্যাসের সময় কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়মধ্যস্থ এক বিন্দুর উপর মনকে ধারণা করিতে হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন। অতএব সহজ উপায় এই যে, হৃদয়ে একটি পদ্মের চিন্তা কর, উহা

যেন জ্যোতিঃতে পূর্ণ—চারিদিকে সেই জ্যোতিঃ-আভা বিকীর্ণ হইতেছে, সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ সহস্রদল কমল অথবা পূর্ব্বোক্ত সুষুম্নার মধ্যস্থ চক্রগুলিকে জ্যোতিস্ময়রূপে চিন্তা করিবে।

যোগীর প্রতিনিয়তই অভ্যাস আবশ্যক। তাঁহাকে নিঃসঙ্গ-ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নানারূপ লোকের সঙ্গে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার বেশী কথা কওয়া উচিত নয়। কথা বেশী কহিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে। বেশী কার্য্য করা ভাল নয়, কারণ, অধিক কার্য্য করিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর মনঃসংযম করা যায় না। যিনি এইরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্পশালী হইয়া কথিত নিয়মে চলিতে পারেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন। সৎকর্ম্মের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, অতি অল্পমাত্র সৎকর্ম্ম করিলেও মহাফললাভ হয়। ইহাতে অনিষ্ট কাহারও হইবে না, বরং ইহাতে সকলেরই উপকার হইবে। প্রথমতঃ, স্নায়বীয় উত্তেজনা শান্ত হইবে, মনে শান্ত ভাব আনিয়া দিবে, আর সকল বিষয় অতি সুস্পষ্টভাবে দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা আসিবে। মেজাজ ভাল হইবে, স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ ভাল হইবে। যোগীর যোগঅভ্যাসকালে যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়, শরীরের সুস্থতাই তন্মধ্যে প্রথম চিহ্ন; স্বরও সুন্দর হইবে। স্বরের যাহা কিছু বৈকল্য আছে, সমুদয় চলিয়া যাইবে। তাঁহার অনেক প্রকার চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তন্মধ্যে এইগুলিই প্রথম। যাঁহারা অত্যন্ত অধিক সাধনা করেন, তাঁহাদের আরও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন দূর হইতে যেন

ঘণ্টা-ধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনা যাইবে—যেন অনেকগুলি ঘণ্টা দূরে বাজিতেছে ও সেই সমস্ত শব্দ একত্রে মিলিয়া কর্ণে তৈল-ধারাবৎ শব্দপ্রবাহ আসিতেছে। কখন কখন দেখিবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককণা যেন শূন্যে ভাসিতেছে ও ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। যখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তখন বুঝিবে তুমি খুব দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ। যাঁহারা যোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং খুব অধিক অভ্যাস করেন, তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাঁহারা খুব বেশী উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি কয়েক মাস কেবল দুগ্ধ ও অন্নাদি নিরামিষ ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের সাধনের পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। কিন্তু যাহারা অন্যান্য দৈনিক কাজের সঙ্গে অল্পস্বল্প অভ্যাস করিতে চায়, তাহারা বেশী না খাইলেই হইল। খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে পারে।

যাঁহারা অধিক অভ্যাস করিয়া শীঘ্র উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। দেহযন্ত্র উত্তরোত্তর যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকে, ততই তুমি দেখিবে যে, অতি সামান্য অনিয়মে তোমার সমস্ত শরীরের ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত করিয়া দিবে। যতদিন পর্য্যন্ত না মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন একবিন্দু আহারের ন্যূনাধিক্যে একেবারে সমুদয় শরীরযন্ত্রকেই অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিবে। মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর যাহা

ইচ্ছা তাহাই খাইতে পার। তুমি দেখিবে যে, যখন মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তখন একটি সামান্য পিন পড়িলে বোধ হইবে যে, যেন তোমার মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বজ্র চলিয়া গেল। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি যত সূক্ষ্ম হয়, অনুভূতিও তত সূক্ষ্ম হইতে থাকে; এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। আর যাহারা অধ্যবসায়সহকারে শেষ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারে, তাহারাই কৃতকার্য্য হইবে। সর্ব্বপ্রকার তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ আইসে, সমুদয় দূরে পরিত্যাগ কর। শুষ্ক ও কূটতর্কপূর্ণ প্রলাপে কি ফল? উহা কেবল মনের সাম্যভাব নষ্ট করিয়া দিয়া উহাকে চঞ্চল করে মাত্র। এ সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জিনিস। কথায় কি তাহা হইবে? অতএব সর্ব্বপ্রকার বৃথা বাক্য ত্যাগ কর। যাঁহারা প্রত্যক্ষানুভব করিয়া লিখিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ কর।

শুক্তির ন্যায় হও। ভারতবর্ষে একটি সুন্দর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এই—আকাশে স্বাতীনক্ষত্র তুঙ্গস্থ থাকিতে যদি বৃষ্টি হয়, আর ঐ বৃষ্টিজলের যদি এক বিন্দু কোন শুক্তির উপর পড়ে, তাহা হইলে তাহা একটি মুক্তারূপে পরিণত হয়। শুক্তিগণ ইহা অবগত আছে; সুতরাং ঐ নক্ষত্র আকাশে উঠিলে তাহারা জলের উপর আসিয়া ঐ সময়কার একবিন্দু অমূল্য বৃষ্টিকণার জন্য অপেক্ষা করে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর পড়ে, অমনি সে ঐ জলকণাটিকে আপনার ভিতরে লইয়া খোলাটি বন্ধ করিয়া একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায় ও

তথায় গিয়া অতীব সহিষ্ণুতাসহকারে উহা হইতে মুক্তা প্রস্তুত করিবার জন্য যত্নবান হয়। আমাদেরও ঐ শুক্তির ন্যায় হইতে হইবে। প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিহার করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্য-তত্ত্বকে বিকাশ করিবার জন্য যত্নবান হইতে হইবে। একটি ভাবকে নূতন বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেটির নূতনত্ব চলিয়া গেলে পুনরায় আর একটি নূতন ভাব আশ্রয় করা, এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের সমুদয় শক্তি নানাদিকে ক্ষয় হইয়া যায়। সাধন করিবার সময় এইরূপ নূতনভাব-প্রিয়তারূপ বিপদ আইসে। একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই থাক। উহার শেষ পর্য্যন্ত দেখ। উহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটা ভাব লইয়া মাতিয়া থাকিতে পারেন, তাহারই হৃদয়ে সত্য-তত্ত্বের উন্মেষ হয়। আর যাহারা এখানকার একটু ওখানকার একটু এইরূপ অন্নাস্বাদনবৎ সকল বিষয়ে একটু একটু দেখে, তাহারা কখনই কোন বস্তু লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের স্নায়ু একটু উত্তেজিত হইয়া তাহাদের একরূপ আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে আর কিছু ফল হয় না। তাহারা চিরকাল প্রকৃতির দাস হইয়া থাকিবে, কখনই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে না।

যাঁহারা যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এইরূপ প্রত্যেক জিনিস একটু একটু করিয়া ঠোকরান ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। একটি ভাব লইয়া ক্রমাগত তাহাই

চিন্তা করিতে থাক। শয়নে স্বপনে সর্ব্বদাই উহা লইয়াই থাক। তোমার মস্তিষ্ক, স্নায়ু, শরীরের সর্ব্বাঙ্গই এই চিন্তায় পূর্ণ থাকুক। অন্য সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। ইহাই সিদ্ধ হইবার উপায়; আর কেবল এই উপায়েই বড় বড় ধর্ম্মবীরের উদ্ভব হইয়াছে। বাকী আর সকলেই কেবল বাক্যব্যয়শীল যন্ত্র মাত্র। যদি আমরা নিজেরা কৃতার্থ হইতে ও অপরকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে শুধু কথা ছাড়িয়া আরও ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রথম সোপান এই যে, মনকে কোনমতে চঞ্চল করিবে না; আর যাহাদের সঙ্গে কথা কহিলে মনের চঞ্চলতা আসে, তাহাদের সঙ্গ করিবে না। তোমরা সকলেই জান যে, তোমাদের প্রত্যেকেরই স্থানবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ ও খাদ্যবিশেষের প্রতি যেন একটা বিরক্তির ভাব আছে। ঐগুলিকে পরিত্যাগ করিবে। আর যাহারা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভের অভিলাষী, তাহাদিগকে সৎ অসৎ সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। মর, বাঁচ, কিছুই গ্রাহ্য করিও না। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন।' ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন-সাগরে ডুবিয়া যাইতে হইবে। নির্ভীক হইয়া এইরূপে দিবারাত্র সাধন করিলে ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে পারিবে। কিন্তু আর যাহারা অল্পস্বল্প সাধনা করে, সব বিষয়েই একটু আধটু দেখে, তাহারা কখনই বড় কিছু উন্নতি করিতে পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে কোন ফললাভ হয় না। যাহারা তমোগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান ও অলস, যাহাদের মন কোন

একটা জিনিসের উপর স্থির হইয়া বসে না, যাহারা কেবল একটুখানি আমোদের অন্বেষণ করে, তাহাদের পক্ষে ধর্ম্ম ও দর্শন কেবল ক্ষণিক আমোদের জন্য; সেই আমোদটুকু তাহারা পাইয়াও থাকে। ইহারা সাধনে অধ্যবসায়হীন। তাহারা ধর্ম্মকথা শুনিয়া মনে করে, বাঃ, এ ত বেশ; তার পর বাড়ীতে গিয়া সব ভুলিয়া যায়। সিদ্ধ হইতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, মনের অসীম বল আবশ্যক। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজঃ, এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই সেই পরমপদ লাভ হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

ধ্যান ও সমাধি

এতক্ষণে আমরা রাজযোগের অন্তরঙ্গ সাধনগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদয় অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করিয়াছি। ঐ অন্তরঙ্গ সাধনগুলির লক্ষ্য—একাগ্রতা লাভ। এই একাগ্রতা-শক্তি-লাভই রাজযোগের চরম লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যজাতির যত কিছু জ্ঞান, যাহাদিগকে বিচারজাত জ্ঞান বলে, সে সকলই অহংবুদ্ধির অধীন। আমি এই টেবিলটিকে জানিতেছি, আমি তোমার অস্তিত্বের বিষয় জানিতেছি, এইরূপে আমি অন্যান্য বস্তুও জানিতেছি। আর এই অহংজ্ঞানবশতঃ আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখানে, টেবিলটি এখানে, আর অন্যান্য যে সকল বস্তু দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি বা শুনিতেছি, তাহারাও এখানে রহিয়াছে। ইহা ত গেল একদিকের কথা। আবার আর একদিকে ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, আমার সত্তা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার অনেকটাই আমি অনুভব করিতে পারি না। শরীরাভ্যন্তরস্থ সমুদয় যন্ত্র, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি কাহারও জ্ঞানের বিষয় নহে।

যখন আমি আহার করি, তখন তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক করি, কিন্তু যখন আমি উহার সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করি, তখন আমি

উহা অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি। যখন উহা রক্ত-রূপে পরিণত হয়, তখনও উহা আমার অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। আবার যখন ঐ রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত হয়, তখনও উহা আমার অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমুদয় ব্যাপারগুলি আমার দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে। এই শরীরের মধ্যে ত আর বিশটি লোক বসিয়া নাই যে ঐ কার্য্যগুলি করিতেছে। কিন্তু কি করিয়া জানিলাম যে, আমিই ঐগুলি করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে না? এ বিষয়ে ত অনায়াসেই আপত্তি হইতে পারে যে, আহার করার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক; খাদ্য পরিপাক করা ও তাহা হইতে শরীর গঠন করা আমার জন্য আর একজন করিয়া দিতেছে। একথা কথাই নহে; কারণ ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যে সকল কার্য্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই আবার সাধন-বলে আমাদের জ্ঞাতসারে সাধিত হইতে পারে। আমাদের হৃদয়যন্ত্রের কার্য্য আপনিই চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, আমরা কেহই উহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারি না, উহা নিজের খেয়ালে নিজে চলিতেছে। কিন্তু এ হৃদয়েব কার্য্যও অভ্যাসবলে এমন ইচ্ছাধীন করা যাইতে পারে যে, ইচ্ছামাত্রে উহা শীঘ্র বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরের প্রায় সমুদয় অংশই আমাদের বশে আনা যাইতে পারে। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষণে যে সকল কার্য্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাহাও আমরা করিতেছি; তবে অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এইমাত্র। অতএব

দেখা গেল, মনুষ্যমন দুই অবস্থায় থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে জ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে। যে সকল কার্য্য করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমি করিতেছি, এই জ্ঞান সদাই বিদ্যমান থাকে, সেই সকল কার্য্য জ্ঞানভূমি হইতে সাধিত হয়, বলা যায়। আর একটি ভূমির নাম অজ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে। যে সকল কার্য্য জ্ঞানের নিম্নভূমি হইতে সাধিত হয়, যাহাতে 'আমি' জ্ঞান থাকে না, তাহাকে অজ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে।

আমাদের কার্য্যকলাপের মধ্যে যাহাতে 'অহং' মিশ্রিত আছে, তাহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়া, আর যাহাতে 'অহং'এর সংস্রব নাই তাহাকে অজ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়া বলা যায়। নিম্নজাতীয় জন্তুতে এই অজ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্যগুলিকে সহজাতজ্ঞান (instinct) বলে। তদপেক্ষা উচ্চতর জীবে ও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম জীব মনুষ্যে এই দ্বিতীয় প্রকার কার্য্য অর্থাৎ যাহাতে 'অহং'এর ভাব থাকে, তাহাই অধিক দেখা যায়—উহাকেই জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়া বলে।

কিন্তু এই দুইটি বলিলেই যে সকল ভূমির কথা বলা হইল, তাহা নহে। মন এই দুইটি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। যেমন অজ্ঞানভূমি হইতে যে কার্য্য হয়, তাহা জ্ঞানের নিম্নভূমির কার্য্য, তদ্রূপ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতেও কার্য্য হইয়া থাকে। উহাতে কোনরূপ 'অহং'এর কার্য্য হয় না। এই অহংজ্ঞানের কার্য্য কেবল মধ্য অবস্থায় হইয়া থাকে। যখন মন এই অহং-

জ্ঞানরূপ রেখার ঊর্দ্ধে বা নিম্নে বিচরণ করে তখন কোনরূপ অহংজ্ঞান থাকে না, কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। যখন মন এই জ্ঞানভূমির অতীত প্রদেশে গমন করে তখন তাহাকে সমাধি, পূর্ণ চৈতন্য-ভূমি বা জ্ঞানাতীত ভূমি বলে। এই সমাধি জ্ঞানেরও পরপারে অবস্থিত। এক্ষণে আমরা কেমন করিয়া জানিব যে, মানুষ সমাধি-অবস্থায় জ্ঞানভূমির নিম্নস্তরে গমন করে কি-না—একেবারে হীনদশাপন্ন হইয়া পড়ে কি-না? এই উভয় অবস্থার কার্য্যই ত অহংজ্ঞানশূন্য। ইহার উত্তর এই, কে জ্ঞানভূমির নিম্নদেশে আর কেই বা ঊর্দ্ধদেশে গমন করিল, তাহা ফল দেখিয়াই নির্ণীত হইতে পারে। যখন কেহ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, সে তখন জ্ঞানের নিম্নভূমিতে চলিয়া যায়। সে অজ্ঞাতসারে তখনও শরীরের সমুদয় ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, এমন কি শরীর-সঞ্চালন-ক্রিয়া পর্য্যন্ত করিয়া থাকে; তাহার এই সকল কার্য্যে অহংভাবের কোন সংস্রব থাকে না; তখন সে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে; নিদ্রা হইতে যখন উত্থিত হয়, তখন সে যে মানুষ ছিল, তাহা হইতে কোন অংশে তাহার বৈলক্ষণ্য হয় না। তাহার নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাহার যে জ্ঞানসমষ্টি ছিল, নিদ্রাভঙ্গের পরও ঠিক তাহাই থাকে, উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না। তাহার হৃদয়ে কোন নূতন তত্ত্বালোক প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ হইবার পূর্ব্বে সে যদি মহামূর্খ, অজ্ঞান থাকে, সমাধিভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হইয়া উঠিয়া আসে।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, এই বিভিন্নতার কারণ কি? এক অবস্থা হইতে মানুষ যেমন গিয়াছিল, সেইরূপই ফিরিয়া আসিল; আর

এক অবস্থা হইতে ফিরিয়া মানুষ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইল—এক মহাসাধু সিদ্ধপুরুষরূপে পরিণত হইল, তাঁহার স্বভাব একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাঁহার জীবন একেবারে অন্য আকার ধারণ করিল। এই ত দুই অবস্থার বিভিন্ন ফল। এক্ষণে কথা হইতেছে, ফল ভিন্ন ভিন্ন হইলে কারণও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে। আর সমাধি অবস্থা হইতে লব্ধ এই জ্ঞানালোক যখন অজ্ঞান-অবস্থা হইতে ফিরিবার পরের অবস্থা বা সাধারণ জ্ঞানাবস্থায় যুক্তিবিচারলব্ধ জ্ঞান হইতে অনেক উচ্চতর জ্ঞান, তখন উহা অবশ্যই জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে আসিতেছে। সমাধিকে সেইজন্যই জ্ঞানাতীত ভূমি নামে অভিহিত করিয়াছি।

সমাধি বলিলে সংক্ষেপে ইহাই বুঝায়। আমাদের জীবনে এই সমাধির কার্য্যকারিতা কোথায়? সমাধির বিশেষ কার্য্য-কারিতা আছে। আমরা জ্ঞাতসারে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, যাহাকে বিচারের অধিকারভূমি বলা যায়, তাহা অতিশয় সীমাবদ্ধ। মানব-যুক্তি একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই কেবল ভ্রমণ করিতে পারে। উহা তাহার বাহিরে আর যাইতে পারে না। আমরা যতই উহার বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, ততই ঐ চেষ্টা যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলেও মনুষ্য যাহা অতিশয় মূল্যবান বলিয়া আদর করে, তাহা ঐ যুক্তিরাজ্যের বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাশী আত্মা আছে কি-না, ঈশ্বর আছেন কি-না, এই সমুদয় জগতের নিয়ন্তা পরমজ্ঞান-স্বরূপ কেহ আছেন কি-না—এ সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যুক্তি অপারগ। যুক্তি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ। যুক্তি কি বলে?

যুক্তি বলে, 'আমি অজ্ঞেয়বাদী, আমি কোন বিষয়ে হাঁ-ও বলিতে পারি না, না-ও বলিতে পারি না'। কিন্তু এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর করিতে না পারিলে মানবজীবন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই যুক্তিরূপ বৃত্তের বহির্দ্দেশ হইতে লব্ধ সাধনাসমূহই আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সমুদয় নৈতিক ভাব, এমন কি, মনুষ্য-স্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর ভাব আছে, তৎ-সমুদয়েরই ভিত্তি। অতএব এই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা না হইলে মানবের জীবনধারণই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি মনুষ্যজীবন সামান্য পাঁচ মিনিটের জিনিস হয়, আর যদি জগৎ কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক সম্মিলনমাত্র হয়, তাহা হইলে অপরের উপকার আমি কেন করিব? দয়া ন্যায়পরতা অথবা সহানুভূতি জগতে থাকিবার আবশ্যক কি? তাহা হইলে আমাদের ইহাই একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে যে, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করুক, নিজের সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত হউক। যদি আমাদের ভবিষ্যতে অস্তিত্বের আশাই না থাকে, তবে আমি আমার ভ্রাতার গলা না কাটিয়া তাহাকে ভালবাসিব কেন? যদি সমুদয় জগতের অতীত সত্তা কিছু না থাকে, যদি মুক্তির আশাই না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর, অভেদ্য, জড় নিয়মই সর্ব্বস্ব হয়, তবে যাহাতে আমরা ইহলোকে সুখী হইতে পারি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। আজকাল অনেকের মতে, নীতির ভিত্তি হিতবাদ (Utility) অর্থাৎ যাহাতে অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে, তাহাই

নীতির ভিত্তি। ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নীতি পালন করিব, তাহার হেতু কি? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কেন না আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব? হিতবাদিগণ (Utilitarians) এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা তুমি কি করিয়া জানিবে? আমি আমার সুখ-বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া উহার তৃপ্তিসাধন করিলাম, উহা আমার স্বভাব, আমি উহা অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না। আমার বাসনা রহিয়াছে, আমি উহার তৃপ্তিসাধন করিব, তোমার উহাতে আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে? মনুষ্য-জীবনের এই সকল মহৎ সত্য, যথা—নীতি, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর, প্রেম ও সহানুভূতি, সাধুত্ব ও সর্ব্বাপেক্ষা মহাসত্য যে নিঃস্বার্থপরতা, এই সকল ভাব আমাদের কোথা হইতে আসিল?

সমুদয় নীতি-শাস্ত্র, মানুষের সমুদয় কার্য্য, মানুষের সমুদয় চিত্তবৃত্তি এই নিঃস্বার্থপরতারূপ একমাত্র ভাবের (ভিত্তির) উপর স্থাপিত, মানবজীবনের সমুদয় ভাব, এই নিঃস্বার্থপরতারূপ একমাত্র কথার ভিতর সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। আমি কেন স্বার্থশূন্য হইব? নিঃস্বার্থপর হইবার প্রয়োজনীয়তা কি? আর কি শক্তিবলেই বা আমি নিঃস্বার্থ হইব? তুমি বলিয়া থাক, 'আমি যুক্তিবাদী, আমি হিতবাদী'; কিন্তু তুমি যদি আমাকে 'জগতের হিতসাধন করিতে কেন যাইবে,' তদ্বিষয়ে যুক্তি দেখাইতে না পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি অযৌক্তিক আখ্যা প্রদান করিব। আমি যে নিঃস্বার্থপর হইব, তাহার

কারণ দেখাও; কেন আমি বুদ্ধিহীন পশুর আচরণ করিব না? অবশ্য নিঃস্বার্থপরতা কবিত্ব হিসাবে অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব ত যুক্তি নহে। আমাকে যুক্তি দেখাও; কেন আমি নিঃস্বার্থপর হইব, কেন আমি সাধু হইব? অমুক এই কথা বলেন, অতএব এইরূপ কর—এইরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা আমি মানি না। আমি যে নিঃস্বার্থপর হইব, ইহাতে আমার হিত কোথায়? স্বার্থপর হইলেই আমার হিত হয়—'হিত' অর্থে যদি 'অধিক পারিমাণে সুখ' বুঝায়। আমি অপরকে প্রতারণা করিয়া ও অপরের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ লাভ করিতে পারি। হিতবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিবেন? তাঁহারা ইহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন না। ইহার প্রকৃত উত্তর এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি অনন্ত সমুদ্রের ক্ষুদ্র বুদ্বুদ—একটি অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। যাঁহারা জগতে নিঃস্বার্থপরতা প্রচার করিয়াছিলেন ও মনুষ্য-জাতিকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এ তত্ত্ব কোথায় পাইলেন? আমরা জানি, ইহা সহজাতজ্ঞানলভ্য নহে। পশুগণ, যাহারা এই সহজাত-জ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ত ইহা জানে না, বিচার-বুদ্ধিতেও ইহা পাওয়া যায় না, এই সকল তত্ত্বের কিছুমাত্র জানা যায় না। তবে ঐ সকল তত্ত্ব তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন?

ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের সমুদয় ধর্ম্ম-শিক্ষক ও ধর্ম্মপ্রচারকই, 'আমরা জগতের অতীত প্রদেশ হইতে এই সকল সত্য লাভ করিয়াছি' বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা

অনেকেই এই সত্য ঠিক কোথা হইতে পাইলেন, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কেহ হয় ত বলিলেন, "এক স্বর্গীয় দূত পক্ষযুক্ত মনুষ্যাকারে আমার নিকট আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'ওহে মানব, শুন, আমি স্বর্গ হইতে এই সুসমাচার আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর'।" আর একজন বলিলেন, "তেজঃ-পুঞ্জকায় এক দেবতা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাকে উপদেশ দিলেন।" আর একজন বলিলেন, "আমি স্বপ্নে আমার পিতৃ-পুরুষগণকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহারা আমাকে এই সকল তত্ত্ব উপদেশ দিলেন।" ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্ত্বলাভের কথা বলিলেও ইঁহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করেন নাই, উহার অতীত-প্রদেশ হইতে তাঁহারা উহা লাভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে যোগশাস্ত্রের মত কি? ইহার মতে—তাঁহারা যে বলেন, যুক্তিবিচারের অতীত-প্রদেশ হইতে তাঁহারা ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু তাঁহাদের নিজের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান তাঁহাদের নিকট আসিয়াছে।

যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চাবস্থা আছে, যাহা বিচার-যুক্তির অধিকারের অতীত বা জ্ঞানাতীত-ভূমি। এ উচ্চাবস্থায় পৌঁছিলেই মানব তর্কের অগম্য জ্ঞান লাভ করে। সেই ব্যক্তিরই সমুদয় বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ পরমার্থজ্ঞান—বিচারের অতীত জ্ঞান—যে জ্ঞানে তর্কযুক্তি চলে না,—যাহাতে লোকে সাধারণ

মানবীয় জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে, তাহা কখন কখন লোকের দৈবাৎ লাভ হইতে পারে; সে ব্যক্তি অতীন্দ্রিয়জ্ঞান-লাভের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার ঐ জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক হয় না। কে যেন তাহাকে ঐ জ্ঞানরাজ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। আর ঐরূপ হঠাৎ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানলাভ হইলে সে সাধারণতঃ মনে করে যে, ঐ জ্ঞান বহিঃ-প্রদেশ হইতে আসিতেছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই পারমার্থিক জ্ঞান সকল দেশেই প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও কোন দেশে দেবদূত হইতে, কোন দেশে দেশবিশেষ হইতে, আবার কোথাও বা সাক্ষাৎ ভগবান হইতে প্রাপ্ত বলিয়া শুনা যায় কেন? ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, মন নিজ প্রকৃতিবশে নিজ অভ্যন্তর হইতেই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা উহা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ শিক্ষা ও বিশ্বাস অনুসারে ঐ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ইঁহারা সকলেই ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন।

যোগীরা বলেন, এই জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়ায় এক ঘোর বিপদাশঙ্কা আছে। অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আরও দেখিবে, যে সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝেন নাই, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহারা সাধারণতঃ অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানের সহিত কিছু না কিছু কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত আছেই আছে।

তাঁহারা অনেক আজগুবি খেয়াল দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা অনেক মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, সমাধি লাভ করিতে পূর্বোক্তরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাঁহারা সকলেই যে ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা যে কোনরূপে হউক, ঐ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন: তবে আমরা দেখিতে পাই, যখন কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসবশে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কুসংস্কার, গোঁড়ামি এ সকলও তাঁহাতে আসিয়াছে। তাঁহার শিক্ষার ভিতরে যে উৎকৃষ্ট অংশ, তদ্দ্বারা যেমন জগতের উপকার হইয়াছে, ঐ সকল কুসংস্কারাদির দ্বারা তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে। মনুষ্যজীবন নানাপ্রকার বিপরীতভাবে আক্রান্ত বলিয়া অসামঞ্জস্যপূর্ণ; এই অসামঞ্জস্যের ভিতর কিছু সামঞ্জস্য ও সত্যলাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে তর্কযুক্তির অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে। কিন্তু উহা ধীরে ধীরে করিতে হইবে; নিয়মিত সাধনাদ্বারা ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাতে পৌছিতে হইবে, আর সমুদয় কুসংস্কারও আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। অন্য কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, ইহাতেও ঠিক সেই ধারার অনুসরণ এবং যুক্তি-বিচারকেই আমাদের ভিত্তিস্বরূপ করিতে হইবে। তর্কযুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়া যাইতে পারে, ততদূর যাইতে হইবে।

তৎপরে যখন আর তর্কযুক্তি চলিবে না, তখন উহাই সেই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে। অতএব যখন কেহ নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া দাবি করে অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ যা-তা বলিতে থাকে, তাহার কথা শুনিও না। কেন? কারণ, যে তিন অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, যথা—পশুপক্ষীতে দৃষ্ট সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্ব্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা, উহারা একই মনের অবস্থাবিশেষ। একজন লোকের তিনটি মন থাকিতে পারে না, সেই এক মনই অপরভাবে পরিণত হয়। সহজাত-জ্ঞান বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানে ও বিচারপূর্ব্বক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত অবস্থায় পরিণত হয়; সুতরাং এই কয়েক অবস্থার মধ্যে এক অবস্থা অপর অবস্থার বিরোধী নহে। অতএব যখন কাহারও নিকট অসম্বদ্ধ প্রলাপতুল্য এবং যুক্তি ও সহজজ্ঞানবিরুদ্ধ কথাবার্ত্তা শুনিতে পাও, তখন নির্ভীক অন্তরে উহা প্রত্যাখ্যান করিও; কারণ, প্রকৃত প্রত্যাদেশ বিচারজনিত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা মাত্র সাধন করে। পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ যেমন বলিয়াছেন, 'আমরা বিনাশ করিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি'—এইরূপ প্রত্যাদেশও বিচার-জনিত জ্ঞানের-পূর্ণতাসাধক। বিচার-জনিত জ্ঞানের সহিত উহার সম্পূর্ণ সমন্বয় আছে, আর যখনই উহা যুক্তির বিরোধী হইবে, তখনই জানিবে, উহা যথার্থ প্রত্যাদেশ নহে।

ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাধি-অবস্থা লাভের জন্যই পূর্ব্ব-কথিত সমুদয় যোগাঙ্গগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে। আরও এটি বুঝা বিশেষ আবশ্যক যে, এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভের শক্তি প্রাচীন

মহাপুরুষগণের ন্যায় প্রত্যেক মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহারা আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রকৃতির জীববিশেষ ছিলেন না, তাঁহারা তোমার আমার মতই মানুষ ছিলেন। অবশ্য তাঁহারা খুব উচ্চাঙ্গের যোগী ছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তবে চেষ্টা করিলে তুমি আমিও উহা লাভ করিতে পারি। তাঁহারা যে কোন বিশেষ-প্রকার অদ্ভুত লোক ছিলেন, তাহা নহে। এক ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, উহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব। ইহা যে শুধু সম্ভব তাহা নহে, সকলেই কালে এই অবস্থা লাভ করিবেই করিবে, আর এই অবস্থা লাভ করাই ধর্ম্ম। কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়। আমরা সারা জীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে সত্যের কণামাত্রও বুঝিতে পারিব না। কয়েকখানি পুস্তক পড়াইয়া তুমি কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়া তুলিবার আশা করিতে পার না। কেবল একখানি মানচিত্র দেখাইলে কি আমার দেশ দেখিবার কৌতূহল-চরিতার্থ হইবে? নিজে তথায় গিয়া সেই দেশ প্রত্যক্ষ করিলে তবে আমার কৌতূহল মিটিবে। মানচিত্র কেবল দেশটির আরও অধিক জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য নাই। কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর করিলে, মনুষ্যমনকে কেবল অবনতির দিকে লইয়া যায়। ঈশ্বরীয় জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে বা ঐ শাস্ত্রে আবদ্ধ বলা অপেক্ষা ঘোর নাস্তিকতা আর কি হইতে পারে?

মানুষ ভগবানকে অনন্ত বলে, আবার এক ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভিতর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে চায়! কি আস্পর্দ্ধা! পুঁথিতে বিশ্বাস করে নাই বলিয়া, 'একখানি গ্রন্থের ভিতরে সমুদয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান আবদ্ধ,'—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক হত হইয়াছে। অবশ্য সে হত্যাদির যুগ আর এখন নাই, কিন্তু জগৎ এখনও এই গ্রন্থ-বিশ্বাসে ভয়ানক জড়িত।

ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে, আমি তোমাদিগকে রাজযোগবিষয়ে যে সকল উপদেশ দিতেছি, তাহার প্রত্যেক সাধনটির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। পূর্ব্ব বক্তৃতায় প্রত্যাহার ও ধারণা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এক্ষণে ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিব। (দেহের অনুবর্ত্তী অথবা বাহিরের কোন প্রদেশে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাখিবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিলে উহার ঐ দিকে অবিচ্ছেদ্য গতিতে প্রবাহিত হইবার শক্তি লাভ হইবে। এই অবস্থার নাম ধ্যান) যখন ধ্যানশক্তি এতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় যে, অনুভূতির বহির্ভাগটি পরিত্যক্ত হইয়া কেবল উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ অর্থের দিকেই মন সম্পূর্ণরূপে গমন করে, তখন সেই অবস্থার নাম সমাধি। (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে একত্রে লইলে, তাহাকে সংযম বলে; অর্থাৎ (১) যদি কেহ কোন বস্তুর উপর মনকে একাগ্র করিতে পারে, (২) পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ বস্তুর উপর একাগ্রতাপ্রবাহ চালাইতে পারে, (৩) অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত একাগ্রতা দ্বারা, যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে ঐ বাহ্য বস্তুর অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল তাহার উপর মনকে ধরিয়া

রাখিতে পারে, সমুদয়ই এইরূপ শক্তিসম্পন্ন মনের বশীভূত হইয়া যায়।

যত প্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে এই ধ্যানাবস্থাই জীবের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। যতদিন বাসনা থাকে, ততদিন যথার্থ সুখ আসিতে পারে না, কেবল যখন কোন ব্যক্তি সমুদয় বস্তু এই ধ্যানাবস্থা হইতে অর্থাৎ সাক্ষিভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত সুখলাভ হয়। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। মানুষের সুখ—বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। যিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট জগৎ যথার্থই অতি সুন্দররূপে প্রতীয়মান হয়। যাঁহার বাসনা নাই, যিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, তাঁহার নিকট প্রকৃতির এই বিভিন্ন পরিবর্ত্তন কেবল এক মহা-সৌন্দর্য্য ও মহান্ ভাবের ছবিমাত্র।

ধ্যানে এই তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম। প্রথমে বাহির হইতে একটি কম্পন আসিল, তৎপরে স্নায়বীয় গতি—উহা মনেতে ঐ কম্পনটিকে লইয়া গেল, পরে মন হইতে আবার এক প্রতিক্রিয়া হইল, উহার সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উদয় হইল। এই বাহ্য বস্তুটিই আকাশীয় কম্পন হইতে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন-গুলির কারণ। যোগশাস্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বলে। শারীরবিধান শাস্ত্রের ভাষায় ঐগুলিকে আকাশী কম্পন, স্নায়ু ও মস্তিষ্কমধ্যস্থ গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া এইরূপ আখ্যা দেওয়া যায়। এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও

এখন এমনভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে, উহাদের প্রভেদ আর বুঝা যায় না। আমরা বাস্তবিক এক্ষণে ঐ তিনটির কোনটিকেই অনুভব করিতে পারি না, কেবল উহাদের সম্মিলনের ফলস্বরূপ বাহ্য বস্তুমাত্র অনুভব করি। প্রত্যেক অনুভবক্রিয়াতেই এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে, আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিব না কেন?

প্রথমোক্ত যোগাঙ্গগুলির অভ্যাসের দ্বারা যখন মন দৃঢ় ও সংযত হয় ও সূক্ষ্মতর অনুভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে ধ্যানে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, স্থূল বস্তু লইয়া ধ্যান করা আবশ্যক। পরে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর ধ্যানে অধিকার হইবে, পরিশেষে আমরা বিষয়শূন্য অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ধ্যানে কৃতকার্য্য হইব। মনকে প্রথমে অনুভূতির বাহ্য কারণ অর্থাৎ বিষয়, পরে স্নায়ুমণ্ডলমধ্যস্থ গতি, তৎপরে নিজের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুভব করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। যখন কেবল অনুভূতির বাহ্য উপকরণ, অর্থাৎ বিষয়সমূহকে পৃথক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে, তখন সমুদয় সূক্ষ্ম-ভৌতিক পদার্থ, সমুদয় সূক্ষ্ম-শরীর ও সূক্ষ্ম-রূপ জানিবার ক্ষমতা হইবে। যখন আভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে অন্য সমুদয় বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া জানা যাইবে, তখন মানসিক বৃত্তিপ্রবাহগুলিকে—আপনার মধ্যেই হউক বা অপরের মধ্যেই হউক—জানিতে পারা যাইবে; এমন কি উহারা ভৌতিক শক্তিরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে উহাদিগকে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে এবং যখন কেবল মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে জানিতে পারা যাইবে, তখন যোগী সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞান লাভ

করিতে পারিবেন; কারণ, যত কিছু বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, এমন কি সমুদয় চিত্তবৃত্তি পর্য্যন্ত এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থালাভ হইলে, তিনি নিজ মনের যেন ভিত্তি পর্য্যন্তও অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাঁহার সম্পূর্ণ বশে আসিবে; যোগীর নিকট তখন নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি আসিবে। কিন্তু যদি তিনি এই সকল শক্তিলাভে প্রলোভিত হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হওয়ায় এতই অনর্থ! কিন্তু যদি তিনি এই সকল অলৌকিক শক্তি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, তবে তিনি মন-রূপ-সমুদ্র-মধ্যস্থ সমুদয় বৃত্তিপ্রবাহকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করা-রূপ যোগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবেন। তখনই মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও দৈহিক নানাবিধ গতি দ্বারা বিচলিত না হইয়া আত্মার মহিমা নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে। তখন যোগী জ্ঞানঘন, অবিনাশী ও সর্ব্বব্যাপিরূপে নিজ স্বরূপের উপলব্ধি করিবেন, বুঝিবেন—তিনি অনাদি কাল হইতেই ঐরূপ রহিয়াছেন।

এই সমাধিতে প্রত্যেক মনুষ্যের, এমন কি, প্রত্যেক প্রাণীর অধিকার আছে। অতি নিম্নতর ইতর জন্তু হইতে অতি উচ্চ দেবতা পর্য্যন্ত, কোন না কোন সময়ে সকলেই এই অবস্থা লাভ করিবে, আর যাহার যখন এই অবস্থা লাভ হইবে, সে তখনই—কেবল তখনই, প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিবে। তবে এক্ষণে আমরা যাহা করিতেছি, এগুলি কি? ঐগুলির সহায়ে আমরা ঐ অবস্থার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। এক্ষণে আমাদের

সহিত, যে ধর্ম্ম না মানে, তাহার বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। কারণ আমাদের অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোনরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি নাই। এই একাগ্রতা-সাধনের প্রয়োজন—প্রত্যক্ষানুভূতি-লাভ। এই সমাধি লাভ করিবার প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষরূপে বিচারিত, নিয়মিত, শ্রেণীবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে। যদি ঠিক ঠিক সাধন হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই আমাদিগকে প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া দিবে। তখন সমুদয় দুঃখ চলিয়া যাইবে, কর্ম্মের বীজ দগ্ধ হইয়া যাইবে, আত্মাও অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

সংক্ষেপে রাজযোগ

(কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, একাদশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত)

যোগাগ্নি মানবের পাপ-পিঞ্জরকে দগ্ধ করে এবং তখন সত্ত্বশুদ্ধি ও সাক্ষাৎ নির্ব্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানও যোগীর মুক্তি-পথের সহায়। যাঁহাতে যোগ ও জ্ঞান উভয়ই বিরাজমান, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। যাঁহারা প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার অথবা সদাসর্ব্বদা মহাযোগ অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে। যোগ দুই প্রকার; যথা—অভাব ও মহাযোগ। যখন আপনাকে শূন্য ও সর্ব্বপ্রকার গুণ-বিরহিত-রূপে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে অভাবযোগ বলে। যদ্দ্বারা আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করা হয়, তাহাকে মহাযোগ বলে। যোগী এই উভয় প্রকার যোগের দ্বারাই আত্ম-সাক্ষাৎকার করেন। আমরা অন্যান্য ও যে সমস্ত যোগের কথা শাস্ত্রে পাঠ করি বা শুনিতে পাই, সে সমস্ত যোগ এই ব্রহ্মযোগের—যে ব্রহ্মযোগে যোগী আপনাকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপে অবলোকন করেন, তাহার এক কণার সমানও হইতে পারে না। ইহাই সমুদয় যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

রাজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

উহাদের মধ্যে যম বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে বুঝায়। এই যম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সদাসর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিংসা না করা বা ক্লেশোৎপাদন না করাকে অহিংসা বলে। অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর নাই। জীবের প্রতি এই অহিংসাভাব অবলম্বন করা অপেক্ষা মানুষের উচ্চতর সুখ আর নাই। সত্য হইতে সমুদয় লাভ হয়, সত্যে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ কথনকেই সত্য বলে। চৌর্য্য বা বলপূর্ব্বক অপরের বস্তু গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সকল অবস্থায় মৈথুনরাহিত্যের নামই ব্রহ্মচর্য্য। অতি কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। অপরিগ্রহ-সাধনের উদ্দেশ্য এই,—কাহারও নিকট কিছু লইলে হৃদয় অপবিত্র হইয়া যায়, গ্রহীতা হীন হইয়া যান, তিনি নিজের স্বাধীনতা বিস্মৃত হন এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া পড়েন।

তপঃ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই কয়েকটিকে নিয়ম বলে। নিয়ম শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত পরিপালন। উপবাস বা অন্যবিধ উপায়ে দেহ-সংযমকে শারীরিক তপস্যা বলে। বেদপাঠ অথবা অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণকে সত্ত্বশুদ্ধিকর স্বাধ্যায় বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে—বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক অপেক্ষা উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ। যে জপ, এত উচ্চস্বরে করা হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে বাচিক বলে। যে জপে কেবল ওষ্ঠে স্পন্দন মাত্র হয়, কিন্তু নিকটবর্ত্তী

ব্যক্তি কোন শব্দ শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাংশু বলে। যাহাতে কোন শব্দ উচ্চারণ হয় না, কেবল মনে মনে জপ করা হয় ও তৎসহ সেই মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করা হয়, তাহাকে মানসিক জপ বলে। উহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ বলিয়াছেন, শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল অথবা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা যে শরীর শুদ্ধ করা হয়, তাহাকে বাহ্য শৌচ বলে; যথা স্নানাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্ম্মাদি দ্বারা মনের শুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। বাহ্য ও আভ্যন্তর শুদ্ধি উভয়ই আবশ্যক। কেবল ভিতরে শুচি থাকিয়া বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ সম্পূর্ণ হইল না। যখন উভয় প্রকার শৌচ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না থাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না। ঈশ্বরের স্তুতি, স্মরণ ও পূজারূপ ভক্তির নাম ঈশ্বর-প্রণিধান।

যম ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইল। তৎপরে আসন। আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক সমান রাখিয়া শরীরটিকে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে হইবে। এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইবে। প্রাণের অর্থ নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি, ও আয়াম অর্থে উহার সংযম। প্রাণায়াম তিন প্রকার—অধম, মধ্যম ও উত্তম। উহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করা যায়, তাহাকে অধম প্রাণায়াম বলে। ২৪ সেকেণ্ড কাল বায়ু

পূরণ করিলে মধ্যম প্রাণায়াম ও ৩৬ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম বলে। অধম প্রাণায়ামে ঘর্ম্ম, মধ্যম প্রাণায়ামে কম্পন এবং উত্তম প্রাণায়ামে আসন হইতে উত্থান হয়। গায়ত্রী বেদের পবিত্রতম মন্ত্র। উহার অর্থ, "আমরা এই জগতের প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান বিকাশ করিয়া দিন।" এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব সংযুক্ত আছে। একটি প্রাণায়ামের সময় তিনটি গায়ত্রী মনে মনে উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রেই প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত আছে, যথা—রেচক, বাহিরে শ্বাসত্যাগ; পূরক, শ্বাসগ্রহণ; ও কুম্ভক, স্থিতি—ভিতরে ধারণ করা। অনুভবশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ ক্রমাগত বহির্ম্মুখীন হইয়া কার্য্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসিতেছে। ঐগুলিকে আমাদের নিজের অধীনে আনয়ন করাকে প্রত্যাহার বলে। আপনার দিকে সংগ্রহ বা আহরণ করা, ইহাই প্রত্যাহার শব্দের প্রকৃত অর্থ।

হৃদ্-পদ্মে, মস্তকের ঠিক মধ্যদেশে বা দেহের অন্য স্থানে মনকে ধারণ করার নাম ধারণা। মনকে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া, সেই একমাত্র স্থানটিকে অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, কতকগুলি বৃত্তিপ্রবাহ উত্থাপিত করা হইল; অন্যবিধ বৃত্তিপ্রবাহ উঠিয়া যাহাতে ঐগুলিকে নষ্ট না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে করিতে প্রথমোক্ত বৃত্তিপ্রবাহগুলিই ক্রমে প্রবলাকার ধারণ করিল এবং শেষোক্তগুলিই কমিয়া কমিয়া শেষে একেবারে চলিয়া গেল; অবশেষে এই বহুবৃত্তিরও নাশ হইয়া একটি

বৃত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিল ; ইহাকে ধ্যান বলে। যখন এই অবলম্বনেরও কিছু প্রয়োজন থাকে না, সমুদয় মনটিই যখন একটি তরঙ্গরূপে পরিণত হয়, মনের এই একরূপতার নাম সমাধি। তখন কোন বিশেষ প্রদেশ অথবা চক্রবিশেষকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত হয় না, কেবল ধ্যেয় বস্তুর ভাবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদি মনকে কোন স্থানে ১২ সেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ধারণা হইবে ; এই ধারণা দ্বাদশ গুণিত হইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে এক সমাধি হইবে।

যেখানে অগ্নি বা জল হইতে কোন বিপদাশঙ্কা আছে এমন স্থানে, শুষ্কপত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বন্যজন্তুসমাকুল স্থলে, চতুষ্পথে, অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অত্যন্ত ভয়জনক স্থানে, বল্মীকস্তূপসমীপে, অথবা দুর্জ্জনাক্রান্ত স্থানে যোগ সাধন করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে খাটে। যখন শরীর অতিশয় অলস বা অসুস্থ বোধ হয়, অথবা মন যখন অতিশয় দুঃখপূর্ণ থাকে, তখন সাধন করিবে না। অতি সুগুপ্ত ও নির্জ্জন স্থানে, যেখানে লোকে তোমাকে বিরক্ত করিতে না আইসে, এমন স্থানে গিয়া সাধন কর। অশুচি স্থানে বসিয়া সাধন করিও না। বরং সুন্দর দৃশ্যযুক্ত স্থানে অথবা তোমার নিজগৃহস্থিত একটি সুন্দর ঘরে বসিয়া সাধন করিবে। সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সমুদয় প্রাচীন যোগিগণ, তোমার নিজ গুরু ও ভগবানকে নমস্কার করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

ধ্যানের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি ধ্যানের প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। ঠিক সরলভাবে উপবেশন করিয়া নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি কর। দেখিবে এই নাসিকাগ্রে দৃষ্টি মনঃস্থৈর্য্যের বিশেষ সহায়ক। চাক্ষুষ স্নায়ুদ্বয়ের বশীকরণ দ্বারা প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমিকেও অনেকটা আয়ত্তাধীনে আনা যায়, সুতরাং উহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তিও আমাদের অনেকটা বশীভূত হইয়া পড়ে। এইবার কয়েকপ্রকার ধ্যানের কথা বলা যাইতেছে। চিন্তা কর, মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম্ম উহার মূলদেশ, জ্ঞান উহার মৃণালস্বরূপ, যোগীর অষ্টসিদ্ধি ঐ পদ্মের অষ্টদলস্বরূপ আর বৈরাগ্য উহার অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকা। যে যোগী অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত হইলেও উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে বহির্দ্দেশবর্ত্তী অষ্টদলরূপে এবং অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকাকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ 'অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত হইলে তাহাতেও বৈরাগ্য'-রূপে বর্ণনা করা হইল। এই পদ্মের অভ্যন্তরে—হিরণ্ময়, সর্ব্বশক্তিমান, অস্পর্শ্য, ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত, কিরণসমূহ পরিব্যাপ্ত—পরম জ্যোতির চিন্তা কর—তাঁহাকে ধ্যান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের বিষয় কথিত হইতেছে। চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, আর ঐ আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখাবৎ জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইতেছে; ঐ জ্যোতিঃ-শিখাকে নিজ আত্মারূপে চিন্তা কর, আবার ঐ জ্যোতির অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্ম্ময় আকাশের চিন্তা কর; উহা তোমার আত্মার আত্মা

পরমাত্মাস্বরূপ ঈশ্বর। হৃদয়ে উহাকে ধ্যান কর। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা অর্থাৎ সকলকে এমন কি, মহাশত্রুকেও ক্ষমা করা,—সত্য, আস্তিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রত-স্বরূপ। এই সমুদয়গুলিতে যদি তুমি সিদ্ধ হইতে না পার, তাহা হইলেও দুঃখিত বা ভীত হইও না। চেষ্টা কর, ধীরে ধীরে সবই আসিবে। বিষয়াভিলাষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি ভগবানের শরণাগত ও তন্ময় হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানের নিকট যাহা কিছু বাঞ্ছা করেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দেন। অতএব তাঁহাকে জ্ঞান, ভক্তি অথবা বৈরাগ্যযোগে উপাসনা কর।

"যিনি কাহারও হিংসা করেন না, যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যাঁহার অহঙ্কার বিগত হইয়াছে, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যিনি সর্ব্বদা যোগযুক্ত, যতাত্মা ও দৃঢ়-নিশ্চয়, যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকসমূহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত হর্ষ, দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, যিনি শুচি, দক্ষ, সুখদুঃখে উদাসীন, যাঁহার দুঃখ বিগত হইয়াছে, যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছু পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহশূন্য, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগৎই যাঁহার গৃহ, যাঁহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী হইতে পারেন।" (গীতা, ১২।১৩-১৯)

* * * *

নারদ নামে এক উচ্চাবস্থাপন্ন দেবর্ষি ছিলেন। যেমন মানুষের মধ্যে ঋষি অর্থাৎ মহামহা যোগী থাকেন, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যেও বড় বড় যোগী আছেন। নারদও সেইরূপ একজন মহাযোগী ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি বন-মধ্য দিয়া গমনকালে দেখিলেন, একজন লোক ধ্যান করিতেছেন। তিনি এত ধ্যান করিতেছেন, এতদিন একাসনে উপবিষ্ট আছেন যে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বল্মীক-স্তূপ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নারদকে বলিলেন, 'প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন?' নারদ উত্তর করিলেন, 'আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি।' তখন তিনি বলিলেন, 'ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি আমাকে কবে কৃপা করিবেন, আমি কবে মুক্তিলাভ করিব।' আরও কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ আর একটি লোককে দেখিলেন। সে ব্যক্তি লম্ফ-ঝম্ফ নৃত্য-গীতাদি করিতেছিল। সেও নারদকে ঐ প্রশ্ন করিল। সেই ব্যক্তির স্বর, বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি সমুদয়ই বিকৃতভাবাপন্ন। নারদ তাহাকেও পূর্ব্বের মত উত্তর দিলেন। সে বলিল, 'ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কবে মুক্ত হইব।' পরে নারদ সেই পথে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার সময় সেই ধ্যানস্থ বল্মীক-স্তূপ-মধ্যস্থ যোগীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবর্ষে, আপনি আমার কথা কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?' নারদ বলিলেন, 'হাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।' তখন যোগী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি কি বলিলেন?' নারদ উত্তর দিলেন, 'ভগবান বলিলেন—আমাকে

পাইতে হইলে, তোমার আর চারি জন্ম লাগিবে।' তখন সেই যোগী অতিশয় বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি এত ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দ্দিকে বল্মীক-স্তূপ হইয়া গিয়াছে, আমার এখনও চারি জন্ম অবশিষ্ট আছে!' নারদ তখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?' নারদ বলিলেন, 'হাঁ, ভগবান বলিলেন, এই তোমার সম্মুখে তিন্তিড়ী বৃক্ষ রহিয়াছে, ইহার যতগুলি পত্র আছে, তোমাকে ততবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।' এই কথা শুনিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, 'আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করিব!' তখন এক দৈববাণী হইল, 'বৎস, তুমি এই মুহূর্ত্তে মুক্তিলাভ করিবে।'. সে ব্যক্তি এইরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার ঐ পুরস্কার লাভ হইল। সে ব্যক্তি এত জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুতেই তাহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তি চারি জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। যে ব্যক্তি মুক্তির জন্য শত শত যুগ অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহার ন্যায় অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলেই উচ্চতম ফললাভ হইয়া থাকে।

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

উপক্রমণিকা

যোগসূত্র-ব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে, যোগীদের সমগ্র ধর্ম্মমত যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, আমি এমন একটি প্রশ্নের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দের সকলেরই এই বিষয়ে একমত বলিয়া বোধ হয়, আর ভৌতিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা আমাদের বর্ত্তমান সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে অবস্থিত এক নির্ব্বিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও ব্যক্তভাবস্বরূপ ; আবার সেই নির্ব্বিশেষভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। যদি এইটুকু স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই, উক্ত নির্ব্বিশেষ অবস্থা শ্রেষ্ঠতর, না বর্ত্তমান অবস্থা ? এমন লোকের অভাব নাই, যাঁহারা মনে করেন এই ব্যক্ত অবস্থাই মানুষের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। অনেক চিন্তাশীল মনীষীর মত, আমরা এক নির্ব্বিশেষ সত্তার ব্যক্তভাব আর এই সবিশেষ অবস্থা নির্ব্বিশেষ অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা মনে করেন, নির্ব্বিশেষ সত্তার কোন গুণ থাকিতে পারে না, সুতরাং উহা নিশ্চয়ই অচৈতন্য, জড়, প্রাণশূন্য।

এই হেতু তাঁহারা বিবেচনা করেন, ইহজীবনেই কেবল সুখভোগ সম্ভব, সুতরাং ইহজীবনের সুখেই আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত। প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই জীবন-সমস্যার আর কি কি মীমাংসা আছে, সেইগুলির বিষয় আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ যাহা তাহাই থাকে, তবে তাঁহার সমুদয় অশুভ চলিয়া যায়, তৎপরিবর্তে কেবল যাহা কিছু ভাল, তাহাই অনন্ত-কালের জন্য থাকিয়া যায়। প্রণালীবদ্ধ নৈয়ায়িক ভাষায় এই সত্যটি স্থাপন করিলে উহা এইরূপ দাঁড়ায় যে, মানুষের চরমগতি এই জগৎ—এই জগতেরই কিছু উচ্চাবস্থা—আর উহার সমুদয় অসৎভাগ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই স্বর্গ বলে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বীদিগের চরম লক্ষ্য। এই মতটি যে অতি অসম্ভব ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়; কারণ তাহা হইতেই পারে না। ভাল নাই অথচ মন্দ আছে বা মন্দ নাই, ভাল আছে—এরূপ হইতেই পারে না। কিছু মন্দ নাই, সব ভাল—এরূপ জগতে বাসের কল্পনাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ আকাশকুসুম বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহার পর আর একটি মত বর্ত্তমান অনেক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শুনা যায়; তাহা এই যে, মানুষ ক্রমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনও তথায় পৌঁছিতে পারিবে না। এই মতও আপাততঃ শুনিতে অতি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক অতিশয় অসঙ্গত, কারণ সরল রেখার কোন গতি হইতে পারে না।

সমুদয় গতিই বৃত্তাকারে হইয়া থাকে। যদি তুমি একটি প্রস্তর লইয়া আকাশে নিক্ষেপ কর, তৎপরে যদি তোমার জীবন পর্য্যাপ্ত হয় ও প্রস্তরটি কোন বাধা না পায়, তবে উহা ঠিক তোমার হস্তে ফিরিয়া আসিবে। যদি একটি সরল রেখাকে অনন্ত পথে প্রসারিত করা হয়, তাহা হইলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত হইয়া শেষ হইবে। অতএব মানুষের গতি সর্ব্বদাই অনন্ত উন্নতির দিকে, তাহার কোথাও শেষ নাই—এই মত অসঙ্গত। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি এক্ষণে এই পূর্ব্বোক্ত মত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। নীতি-শাস্ত্রে বলে, কাহাকেও ঘৃণা করিও না, সকলকে ভালবাসিও। নীতিশাস্ত্রের এই সত্যটি পূর্ব্বোক্ত মতদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া যায়। যেমন তাড়িত অথবা অন্য কোন শক্তি সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, সেই শক্তি—শক্তির আধার-যন্ত্র (dynamo) হইতে বহির্গত হইয়া ঘুরিয়া আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। প্রকৃতির সমুদয় শক্তি সম্বন্ধেই এই নিয়ম। সমুদয় শক্তিই ঘুরিয়া ফিরিয়া যে স্থান হইতে গিয়াছিল, সেই স্থানেই ফিরিয়া আসিবে। এই হেতু কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়, কারণ ঐ শক্তি—ঐ ঘৃণা—যাহা তোমা হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তাহা কালে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যদি তুমি লোককে ভালবাস, তবে সেই ভালবাসা ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। এটি একেবারে অতি সত্য যে, মানুষের অন্তঃকরণ হইতে যে ঘৃণার বীজ নির্গত হয়, তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার উপর আসিয়া পূর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিবে।

কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। ভালবাসা সম্বন্ধেও ঐরূপ। অনন্ত উন্নতি সম্বন্ধীয় মত যে স্থাপন করা অসম্ভব, তাহা আরও অন্যান্য প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনেক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ভৌতিক সমুদয় বস্তুরই চরম গতি এক বিনাশ—সুতরাং "অনন্ত উন্নতির মত" কোন মতেই খাটিতে পারে না। আমরা এই যে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছি, আমাদের এই সব এত আশা, এত ভয়, এত সুখ—ইহার পরিণাম কি? মৃত্যুই আমাদের সকলের চরম গতি। ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত আর কিছুই হইতে পারে না। তবে এইরূপ সরল রেখার গতি কোথায় রহিল? এই অনন্ত উন্নতি কোথায় থাকিল? খানিক দূর গিয়া আবার যেখান হইতে গতি আরম্ভ হইয়াছিল, সেই স্থানেই পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন। নীহারিকা (nebulæ) হইতে কেমন সূর্য্য, চন্দ্র, তারা উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় উহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই চলিতেছে। উদ্ভিদ্‌গণ মৃত্তিকা হইতেই সার গ্রহণ করিতেছে, আবার পচিয়া গিয়া মাটিতেই মিশাইতেছে। যত কিছু আকৃতিমান বস্তু আছে, তাহা এই চতুর্দ্দিকস্থ পরমাণুপুঞ্জ হইতেই উৎপন্ন হইয়া আবার সেই পরমাণুতেই মিশাইতেছে।

একই নিয়ম যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে কার্য্য করিবে, তাহা হইতেই পারে না। নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান। ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে না। যদি ইহা একটি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা হইলে অন্তর্জগতে এ নিয়ম খাটিবে না

কেন? মন উহার উৎপত্তি-স্থানে গিয়া লয় পাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদিগকে সেই আদিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ঐ আদি কারণকে ঈশ্বর বা অনন্তকাল বলে। আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, ঈশ্বরেতে পুনরায় যাইবই যাইব। এই ঈশ্বরকে যে নাম দিয়াই ডাকা হউক না কেন— তাঁহাকে গড্ বল, নির্ব্বিশেষ সত্তা বল, আর প্রকৃতিই বল, অথবা আর যে কোন নামেই তাঁহাকে ডাক না কেন—উহা সেই একই পদার্থ। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'—(তৈঃ উঃ, ৩।১), 'যাঁহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে সমুদয় প্রাণী স্থিতি করিতেছে ও যাঁহাতে আবার সকল ফিরিয়া যাইবে'। ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃতি সর্ব্বত্র এক নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকে। এক লোকে যে কার্য্য হইতেছে, অন্য লক্ষ লক্ষ লোকেও সেই একই নিয়মে কার্য্য হইবে। গ্রহসমূহে যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই পৃথিবী, সমুদয় মনুষ্য ও সমুদয় নক্ষত্রেও সেই একই ব্যাপার চলিতেছে। বৃহৎ তরঙ্গ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের এক মহাসমষ্টি মাত্র। সমুদয় জগতের জীবন বলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবনের সমষ্টিমাত্র বুঝায়। আর এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুই জগতের মৃত্যু।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উদয় হইতেছে যে, এই ভগবানে প্রত্যাবর্ত্তন উচ্চতর অবস্থা অথবা উহা নিম্নতর অবস্থা? যোগমতাবলম্বী দার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন,

'হাঁ, উহা উচ্চাবস্থা।' তাঁহারা বলেন, 'মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা অবনত অবস্থা।' জগতে এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যাহাতে বলে যে, মানুষ পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল ধর্ম্মেই এই একরূপ তত্ত্ব পাওয়া যায় যে. মানুষ আদিতে শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল. সে তৎপরে ক্রমাগত নিম্নদিকে যাইতে থাকে, ক্রমশঃ এতদূর নীচে যায়, যাহার নীচে আর সে যাইতে পারে না। পরে এমন সময় আসিবেই আসিবে, যে সময়ে সে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া উপরে গিয়া পুনরায় সেই পূর্ব্ব স্থানে উপনীত হইবে। বৃত্তাকারে গতি মানুষের হইবেই হইবে। সে যতই নিম্নদিকে চলিয়া যাক না কেন, সে পরিশেষে এই ঊর্দ্ধগতি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে ও পরিশেষে তাহার আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া যাইবে। মানুষ প্রথমে ভগবান হইতে আইসে, মধ্যে সে মনুষ্যরূপে অবস্থিতি করে, পরিশেষে পুনরায় ভগবানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দ্বৈতবাদের ভাষায় এই তত্ত্বটি ঐ ভাবে বলা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, মানুষ ভগবান, আবার ফিরিয়া তাঁহাতেই যায়। যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত ভয়াবহ ব্যাপারসকল রহিয়াছে কেন? আর ইহার অন্তই বা হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থা হয়. তবে ইহার শেষ হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয়, সেটি কখন সর্ব্বোচ্চ অবস্থা হইতে পারে না। এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভাবাপন্ন—প্রাণের অতৃপ্তিকর কেন? ইহার পক্ষে জোর এই পর্য্যন্ত বলা

যাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা একটি উচ্চতর পথে যাইতেছি। আমরা নবজীবন লাভ করিব বলিয়াই এই অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইতেছে। ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া দাও, উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া কিছুকাল পরে একেবারে মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবে, আবার সেই বিশ্লিষ্ট অবস্থা হইতে মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ঐ মহৎ বৃক্ষ হইবার জন্য প্রত্যেক বীজকেই পচিতে হইবে, এইরূপ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইলে প্রত্যেক আত্মাকেই অবনতির অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ইহা হইতেই এইটি বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা যত শীঘ্র এই 'মানব'-সংজ্ঞক অবস্থাবিশেষকে অতিক্রম করিয়া তদপেক্ষা উচ্চাবস্থায় যাই, আমাদের ততই মঙ্গল। তবে কি আত্মহত্যা করিয়া আমরা এ অবস্থা অতিক্রম করিব? কথনই নহে। উহাতে ববং হিতে বিপরীত হইবে। শরীরকে অনর্থক পীড়া দেওয়া, অথবা জগৎকে অনর্থক গালাগালি দেওয়া, এই সংসার-তরণের উপায় নহে। আমাদিগকে এই নৈরাশ্যের পঙ্কিল হ্রদের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে; আর যত শীঘ্র যাইতে পারি ততই মঙ্গল। কিন্তু এটি যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই বর্ত্তমান অবস্থা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা নহে।

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝা বাস্তবিক কঠিন যে, যে নির্ব্বিশেষ অবস্থাকে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলা হয়, তাহা অনেকে যেরূপ আশঙ্কা করেন, প্রস্তর অথবা অর্দ্ধ-জন্তু-অর্দ্ধ-বৃক্ষবৎ জীববিশেষের ন্যায় নহে। এইরূপ ভাবিলেই মহা বিপদ।

যাঁহারা এইরূপ ভাবেন, তাঁহারা মনে করেন জগতে যত অস্তিত্ব আছে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত—এক প্রকার প্রস্তরাদির ন্যায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যে সমুদয় অস্তিত্বকে এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের কি অধিকার আছে? চিন্তা হইতে অনন্ত গুণে উচ্চাবস্থা কি নাই? আলোকের কম্পন অতি মৃদু হইলে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আইসে না. যখন ঐ কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় তখনই আমাদের দৃষ্টিগোচরে আইসে—তখনই আমাদের চক্ষে উহা আলোকরূপে প্রতিভাত হয়। আবার যখন উহা তীব্রতম হয়, তখনও আমরা উহা দেখিতে পাই না, উহা আমাদের চক্ষে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই শেষোক্ত অন্ধকারটি ঐ প্রথমোক্ত অন্ধকারের সহিত কি সম্পূর্ণ এক? উহাদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই? কখনই নহে। উহারা মেরুদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন। প্রস্তরের চিন্তাশূন্যতা ও ভগবানের চিন্তাশূন্যতা উভয়ই কি এক পদার্থ? কখনই নহে। ভগবান চিন্তা করেন না—বিচার করেন না। তিনি কেন করিবেন? তাঁহার নিকট কিছু কি অজ্ঞাত আছে যে, তিনি বিচার করিবেন? প্রস্তর বিচার করিতে পারে না, ঈশ্বর বিচার করেন না—এই পার্থক্য। পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকেরা বিবেচনা করেন যে, চিন্তার রাজ্যের বাহিরে যাওয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার, তাঁহারা চিন্তার অতীত কিছু খুঁজিয়া পান না।

যুক্তির রাজ্য ছাড়াইয়া গিয়া তদপেক্ষাও অনেক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। বাস্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদিগের প্রথম ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। যখন তুমি চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি—সমুদয় ছাড়াইয়া চলিয়া যাও, তখনই তুমি ভগবৎ-প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে। ইহাই জীবনের প্রকৃত প্রারম্ভ। যাহাকে সাধারণতঃ জীবন বলে, তাহা প্রকৃত জীবনে ভ্রূণঅবস্থা মাত্র।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে চিন্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাটি যে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা, তাহার প্রমাণ কি? প্রথমতঃ, জগতের যত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—কেবল যাহারা বাক্য-ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণ—নিজ শক্তিবলে যাঁহারা সমুদয় জগৎকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, যাঁহাদের হৃদয়ে স্বার্থের লেশমাত্রও ছিল না, তাঁহারা জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের জীবন সেই সর্ব্বাতীত অনন্তস্বরূপে পৌঁছিবার পথের একটি বিশ্রামস্থান-মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা কেবল এইরূপ বলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা সকলকেই তথায় যাইবার পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাদের সাধন-প্রণালী সকলকেই বুঝাইয়া দেন যাহাতে সকলেই তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া চলিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বে যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা ব্যতীত জীবন-সমস্যার আর কোন প্রকার সন্তোষকর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা চিরকাল এই চক্রের ভিতর দিয়া কেন

যাইতেছি? কি যুক্তিতে এই দৃশ্যমান সমুদয় ব্যাপারাত্মক জগতের ব্যাখ্যা করা যায়? যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক দূর যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা করিবার না থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা রহিয়া যাইবে। ইহাকেই অজ্ঞেয়বাদ বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা ইন্দ্রিয়ের সমুদয় সাক্ষ্যে যে বিশ্বাস করিব, তাহারই বা যুক্তি কি? আমি তাঁহাকেই প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মরিতে পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়, তবে তাহাতে আমাদিগকে এই শূন্যবাদ অবলম্বন করিয়া জগতে স্থির হইয়া কোথাও তিষ্ঠিতে দিবে না। কেবল অর্থ, যশঃ, নামের আকাঙ্ক্ষা এইগুলি ব্যতীত অপর সমুদয় বিষয়ে নাস্তিক হইলে—সে কেবল জুয়াচোর মাত্র। ক্যাণ্ট (Kant) নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা যুক্তিরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া তাহার অতীত প্রদেশে যাইতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষে যত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলিরই প্রথম কথা, যুক্তির পরপারে গমন করা। যোগীরা অতি সাহসের সহিত এই রাজ্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে এমন এক বস্তু লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হন, যাহা যুক্তির উপরে এবং যেখানেই কেবল আমাদের বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান অবস্থার কারণ পাওয়া যায়। যাহাতে আমাদিগকে জগতের বাহিরে লইয়া যায়, তাহার বিষয় শিক্ষা করিবার এই ফল। "তুমি আমাদের পিতা, তুমি

আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবে।" "ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি" (প্রশ্নোপনিষদ্, ৬।৮) ইহাই ধর্ম্মবিজ্ঞান। আর কিছুই প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞান নামের যোগ্য হইতে পারে না।

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

প্রথম অধ্যায়

সমাধি-পাদ

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—এক্ষণে যোগ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম গ্রহণ করিতে না দেওয়াই যোগ।

ব্যাখ্যা—এখানে অনেক কথা আমাদিগকে বুঝাইতে হইবে। প্রথমতঃ, চিত্ত কি ও বৃত্তিগুলিই বা কি, তাহা বুঝিতে হইবে। আমার এই চক্ষু রহিয়াছে। চক্ষু বাস্তবিক দেখে না। যদি মস্তিষ্কমধ্যস্থ দর্শনেন্দ্রিয় বা দর্শনশক্তিটিকে নাশ করিয়া ফেল, তবে তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, চক্ষের পুতুল অক্ষত থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাহাও থাকিতে পারে তথাপি দেখা যাইবে না। তবেই চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্ত্র মাত্র হইল। উহা প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নহে। দর্শনেন্দ্রিয় , মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত। সুতরাং দেখা গেল, কেবল

দুইটি চক্ষুতে কোন কাজ হইতে পারে না। কখন কখন লোকে চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা যায়। বাহ্য চিত্রটি রহিয়াছে, দর্শনেন্দ্রিয়ও রহিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় একটি বস্তুর প্রয়োজন। (গ্রহণ ধারণ জন্য) মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হওয়া চাই। সুতরাং দর্শনক্রিয়ার জন্য চক্ষুরূপ বহির্যন্ত্র, মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র ও মন এই তিনটি জিনিসের আবশ্যক। কখন কখন এমন হয় যে, রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাইতেছ না। ইহার কারণ কি? কারণ তোমার মন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় নাই। অতএব প্রত্যেক অনুভবক্রিয়ার জন্য চাই—প্রথমতঃ, বাহিরের যন্ত্র, তৎপরে ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়তঃ, এই উভয়েতে মনের যোগ। মন বিষয়াভিঘাতজনিত (আলোচনা) বেদনাকে আরও অভ্যন্তরে বহন করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রিয়া (উহাপোহতত্ত্বজ্ঞান) হয়। এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাব জাগিয়া উঠে। আর এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষ বা প্রকৃত আত্মার নিকট অর্পিত হয়। তিনি তখন এই মিশ্রণটিকে একটি (মূর্ত্তি ও ব্যবধি) বস্তুরূপে উপলব্ধি করেন। ইন্দ্রিয়গণ, মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহংকার মিলিত হইয়া যাহা হয়, তাহাকে অন্তঃকরণ বলে। চিত্তসংজ্ঞক মনের উপাদানীভূত বস্তুর ভিতর উহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া-স্বরূপ। চিত্তের অন্তর্গত এই সকল চিন্তাপ্রবাহকে বৃত্তি (ঘূর্ণি) বলে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, চিন্তা কি পদার্থ? চিন্তা মাধ্যাকর্ষণ বা বিকর্ষণ-শক্তির ন্যায় একপ্রকার শক্তিমাত্র। প্রাকৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে এই শক্তি গৃহীত। চিত্তনামক

যন্ত্রটি এই শক্তিটিকে গ্রহণ করে, আর যখন উহা ভৌতিক প্রকৃতির অপর প্রান্তে নীত হয়, তখনই তাহাকে চিন্তা বলে। এই শক্তি আমাদের খাদ্য হইতে সংগৃহীত হয়। ঐ খাদ্য হইতেই শরীরের গতি ইত্যাদি শক্তি হয়। আর চিন্তারূপ সমুদয় সূক্ষ্মতর শক্তিও উহা হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন চৈতন্যময় নহে। উহা আপাততঃ চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয় মাত্র। এইরূপ বোধ হইবার কারণ কি? কারণ চৈতন্যময় আত্মা উহার পশ্চাতে রহিয়াছে। তুমিই একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ—মন কেবল একটি যন্ত্রমাত্র, যদ্দ্বারা তুমি বহির্জগৎ অনুভব কর। এই পুস্তকখানির কথা ধর, বাহিরে উহার পুস্তক-রূপী অস্তিত্ব নাই। বাহিরে বাস্তবিক যাহা আছে তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহা কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র। যেমন জলে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে জল প্রবাহাকারে বিভক্ত হইয়া ঐ প্রস্তর-খণ্ডকে প্রতিঘাত করে, তদ্রূপ উহা যাইয়া মনে আঘাত প্রদান করে, আর মন হইতে একটি প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং আসল বহির্জগৎটি মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র। পুস্তকাকার, গজাকার বা মনুষ্যাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই; বাহিরের উত্তেজক কারণ হইতে যে মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয় কেবলমাত্র তাহাই আমরা জানিতে পারি। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, "অনুভবের নিত্য সম্ভাব্যতার নাম ভূত"। বাহিরে কেবল ঐ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে। উদাহরণ-স্থলে একটি শুক্তিকে

লওয়া যাউক। তোমরা জান, মুক্তা কিরূপে উৎপন্ন হয়। এক বিন্দু বালুকণা* অথবা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে; তখন সেই শুক্তি ঐ বালুকার চতুর্দ্দিকে একপ্রকার এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে থাকে। তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই যেন আমাদের নিজের এনামেল-স্বরূপ। প্রকৃত জগৎ ঐ বালুকা-কণা। সাধারণ লোকে এ কথা কখন বুঝিতে পারিবে না, কারণ যখনই সে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে, সে তখনই বাহিরে এনামেল নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেলটিকেই দেখিবে। আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যাহা, তাহা মনেরও অতীত। মন তাঁহার হস্তে একটি যন্ত্রতুল্য। তাঁহারই চৈতন্য ইহার ভিতর দিয়া আসিতেছে। যখন তুমি উহার পশ্চাতে দ্রষ্টারূপে অবস্থিত থাক, তখনই উহা চৈতন্যময় হইয়া উঠে। যখন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, তখন উহার একেবারে নাশ হইয়া যায়, উহার অস্তিত্ব মোটেই থাকে না। ইহা হইতে বুঝা গেল, চিত্ত বলিতে কি বুঝায়। উহা মনস্তত্ত্ব-স্বরূপ—বৃত্তিগুলি উহার তরঙ্গ-স্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কার্য্য করে, তখনই উহা ঐ প্রবাহ-রূপ ধারণ করে। জগৎ বলিয়া

* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি, এই লোকপ্রচলিত বিশ্বাসটির কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই; সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র কীটাণু-বিশেষ (Parasite) হইতে মুক্তার উৎপত্তি।

আমাদের যাহা ধারণা আছে, তাহার সমুদয়ই কেবল এই বৃত্তিগুলিকে বুঝিতে হইবে।

আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই না, কারণ উহার উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন সমুদয় তরঙ্গ শান্ত হইয়া জল স্থির হইয়া যায়, তখনই কেবল উহার তলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাওয়া সম্ভব। যদি জল ঘোলা থাকে বা উহা ক্রমাগত নড়িতে থাকে, তাহা হইলে উহার তলদেশ কখনই দেখা যাইবে না। যদি উহা নির্ম্মল থাকে, আর উহাতে বিন্দুমাত্র তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে পাইব। হ্রদের তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—হ্রদটি চিত্ত, আর উহার তরঙ্গগুলি বৃত্তিস্বরূপ। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন ত্রিবিধ-ভাবে অবস্থিতি করে; প্রথমটি অন্ধকারময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পশু ও অতি মূর্খদিগের মন। উহার কার্য্য কেবল অপরের অনিষ্ট করা; এইরূপ মনে আর কোনপ্রকার ভাব উদয় হয় না। দ্বিতীয়, মনের ক্রিয়াশীল অবস্থা, রজঃ—এ অবস্থায় কেবল প্রভুত্ব ও ভোগের ইচ্ছা থাকে। আমি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপর প্রভুত্ব করিব, তখন এই ভাব থাকে। তৃতীয়, যখন সমুদয় প্রবাহ উপশান্ত হয়—হ্রদের জল নির্ম্মল হইয়া যায়—তাহাকে সত্ত্ব বা শান্ত অবস্থা বলা যায়। ইহা জড়াবস্থা নহে, কিন্তু অতিশয় ক্রিয়াশীল অবস্থা। শান্ত হওয়া শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম বিকাশ। ক্রিয়াশীল হওয়া ত সহজ। লাগাম ছাড়িয়া দিলে অশ্বেরা তোমাকে আপনিই টানিয়া লইয়া যাইবে।

যে-সে লোক ইহা করিতে পারে; কিন্তু যিনি এইরূপ দ্রুতধাবনশীল অশ্বকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তিধর পুরুষ। ছাড়িয়া দেওয়া ও বেগ ধারণ করা ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন? শান্ত ব্যক্তি আর অলস ব্যক্তি একপ্রকারের নহে। সত্ত্বকে যেন অলসতা মনে করিও না। যিনি মনের এই তরঙ্গগুলিকে আপনার অধীনে আনিতে পারিয়াছেন, তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াশীলতা নিম্নতর শক্তির ও শান্তভাব উচ্চতর শক্তির প্রকাশ।

এই চিত্ত সদা-সর্ব্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে। উহাকে দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চৈতন্যঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফিরান—ইহাই যোগের প্রথম সোপান; কারণ কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার প্রকৃত পথে যাইতে পারে।

যদিও অতি উচ্চতম হইতে অতি নিম্নতম প্রাণীর ভিতরেই এই চিত্ত রহিয়াছে, তথাপি কেবল মনুষ্যদেহেই আমরা উহাকে বুদ্ধিরূপে বিকশিত দেখিতে পাই। মন যতদিন না বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার পক্ষে এই সকল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা সম্ভব নহে। গো অথবা কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি অসম্ভব, কারণ উহাদের মন আছে বটে, কিন্তু উহাদের মন এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করে নাই।

এই চিত্ত অবস্থাভেদে নানা রূপ ধারণ করে, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র (বিবেকখ্যাতি বা প্রসংখ্যান) *। মন এই চারিপ্রকার অবস্থায়, চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। প্রথম, ক্ষিপ্ত—সে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়া যায়, যে অবস্থায় কর্ম্মবাসনা প্রবল থাকে। এইরূপ মনের চেষ্টা কেবলই সুখ দুঃখ এই দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশ হওয়া। তৎপরে মূঢ় অবস্থা—উহা তমোগুণাত্মক; উহার চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট করা। বিক্ষিপ্ত অবস্থা তাহাই, যখন মন আপনার কেন্দ্রের দিকে যাইবার চেষ্টা করে। এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবতাদের ও মূঢ়াবস্থা অসুরদিগের স্বাভাবিক। একাগ্র চিত্তই আমাদিগকে সমাধিতে লইয়া যায়।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) আপনার (অপরিবর্ত্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

ব্যাখ্যা—যখনই প্রবাহগুলি শান্ত হইয়া যায় ও হ্রদ শান্তভাবাপন্ন হইয়া যায়, তখনই আমরা হ্রদের নিম্নভূমি দেখিতে পাই। মন সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখনই আমরা আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি;

* এখানে নিরুদ্ধ (ধর্ম্মমেঘ বা পরপ্রসংখ্যান) অবস্থার কথা বলা হয় নাই, কারণ নিরুদ্ধাবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে চিত্তবৃত্তি বলা যাইতে পারে না।

তখন আমরা ঐ প্রবাহগুলির সহিত আপনাদিগকে মিশাইয়া ফেলি না, কিন্তু নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকি।

বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—অন্যান্য সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত সময়ে) দ্রষ্টা (চিত্ত) বৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—যেমন কেহ আমাকে নিন্দা করিল, আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম; ইহা একপ্রকার পরিণাম—একপ্রকার বৃত্তি—আমি উহার সহিত আমাকে মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছি; উহার ফল দুঃখ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—বৃত্তি পাঁচপ্রকার—ক্লেশ-যুক্ত ও ক্লেশ-শূন্য।

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রম-জ্ঞান, শাব্দভ্রম, নিদ্রা ও স্মৃতি—বৃত্তি এই পাঁচ প্রকার।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও আগম অর্থাৎ বিশ্বস্ত লোকের বাক্য—এইগুলিই প্রমাণ।

ব্যাখ্যা—যখন আমাদের দুইটি অনুভূতি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী না হয়, তাহাকেই প্রমাণ বলে। আমি কোন বিষয় শুনিলাম; যদি উহা কিছু পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের বিরোধী হয়, তবেই আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, উহা কখনই বিশ্বাস করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ অনুভব বা প্রত্যক্ষ—ইহা একপ্রকার প্রমাণ। যদি আমরা কোনপ্রকার চক্ষুকর্ণের ভ্রমে না পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি, উহার অস্তিত্ব আছে, তাহার ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়, অনুমান—তোমার কোন লিঙ্গজ্ঞান হইল। তাহা হইতে উহা যে বিষয়ের সূচনা করিতেছে তাহাকে জানাইয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, আপ্তবাক্য—যোগী অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষানুভূতি। আমরা সকলেই জ্ঞানলাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তোমাকে আমাকে উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচার-রূপ দীর্ঘকালব্যাপী বিরক্তিকর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্ব যোগী এই সকলের পারে গিয়াছেন। তাঁহার মনশ্চক্ষের সমক্ষে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে উহারা যেন একখানি পাঠ্যপুস্তকস্বরূপ। আমাদের মত জ্ঞানলাভের ঐ মৃদুগতি বিরক্তিকর প্রণালীর ভিতর দিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে আর আবশ্যক করে না। তাঁহার বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞানের

উপলব্ধি করেন। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। এইরূপ ব্যক্তিগণই শাস্ত্রের রচয়িতা, আর এই জন্যই শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। যদি বর্ত্তমান সময়ে এরূপ লোক কেহ থাকেন, তবে তাঁহার কথা অবশ্য প্রমাণরূপে গণ্য হইবে। অন্যান্য দার্শনিকেরা এই আপ্তসম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আপ্তবাক্য সত্য কেন? তাঁহারা ইহার এই উত্তর দেন, 'আপ্তবাক্যের প্রমাণ এই যে, উহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি।' যেমন পূর্ব্বজ্ঞানের বিরোধী না হইলে, তুমি যাহা দেখ, আমি যাহা দেখি, তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, উহারও প্রামাণ্য সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব; যখনই ঐ জ্ঞান, যুক্তি ও মনুষ্যের পূর্ব্ব সত্য অনুভূতিকে খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায়। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আসিয়া বলিতে পারে, আমি চারিদিকে দেবতা দেখিতে পাইতেছি। উহাকে প্রমাণ বলা যাইবে না। প্রথমতঃ, উহা সত্যজ্ঞান হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, উহা যেন আমাদের পূর্ব্বজ্ঞানের বিরোধী না হয়। তৃতীয়তঃ, সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহা নির্ভর করে। অনেককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, এরূপ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ দেখিবার তত আবশ্যক নাই, সে কি বলে সেইটিই জানা বিশেষরূপে আবশ্যক—সে কি বলে ইহাই প্রথম শুনা আবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে এ কথা সত্য হইতে পারে; কোন লোক দুষ্টপ্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে স্বতন্ত্র কথা; কারণ

কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্ম্মের প্রকৃত সত্য লাভ করিতে পারিবে না। এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি আপনাকে আপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কি-না। দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে, সে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছে কি-না। তৃতীয়তঃ, আমাদের দেখা উচিত যে, সে ব্যক্তি যাহা বলে তাহা মনুষ্যজাতির পূর্ব্ব সত্যজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিরোধী কি-না। কোন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইলে, উহা পূর্ব্বের কোন সত্যের খণ্ডন করে না বরং পূর্ব্ব সত্যের সহিত ঠিক খাপ খাইয়া যায়। চতুর্থতঃ, ঐ সত্যকে অপরের প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাব্যতা থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি কোন অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে তোমার উহা দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া দেখিতে পারিবে উহা সত্য কি-না। আবার যিনি ধন-বিনিময়ে আপনার জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আপ্ত নহেন। এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ, তাহার লাভ অথবা যশের আকাঙ্ক্ষা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহা তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার আমাদিগকে এমন কিছু দেওয়া আবশ্যক যাহা আমরা ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে পারি না ও যাহা জগতের কল্যাণকর। আরও দেখিতে হইবে

যে, উহা অন্যান্য সত্যের বিরোধী না হয়; যদি উহা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হয় তবে উহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর। চতুর্থতঃ, সেই ব্যক্তিই যে কেবল ঐ বিষয়ের অধিকারী, আর কেহ নয়, তাহা হইবে না। অপরের পক্ষে যাহা লাভ করা সম্ভব তিনি কেবল নিজের জীবনে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইবেন। তাহা হইলে প্রমাণ তিন প্রকার হইল; প্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়-বিষয়ানুভূতি, অনুমান ও আপ্তবাক্য। এই আপ্ত কথাটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে পারিতেছি না। ইহাকে অনুপ্রাণিত (inspired) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; কারণ, এই অনুপ্রাণন বাহির হইতে আইসে, আর এক্ষণে যে ভাবের কথা হইতেছে, তাহা ভিতর হইতে আইসে। ইহার আক্ষরিক অর্থ—"যিনি পাইয়াছেন"।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—বিপর্য্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নহে। (ইহা তিন প্রকার—সংশয়, বিপর্য্যয় ও তর্ক।)

ব্যাখ্যা—আর এক প্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রান্তি। ইহাকে বিপর্য্যয় বলে; যথা, শুক্তিতে রজত-ভ্রম।

শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ সেই শব্দ-প্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহাকে বিকল্প অর্থাৎ শব্দ-জাত ভ্রম বলে। (ইহা তিন প্রকার—বস্তু, ক্রিয়া ও অভাব।)

ব্যাখ্যা—বিকল্প নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে। একটা কথা শুনিলাম, তখন আর আমরা উহার অর্থবিচার ধীরভাবে না করিয়া তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম। ইহা চিত্তের দুর্ব্বলতার চিহ্ন। সংযমবাদটি এখন বেশ বুঝা যাইবে। মানুষ যত দুর্ব্বল হয়, তাহার সংযমের ক্ষমতা ততই কম থাকে। সর্ব্বদা এই সংযমের মানদণ্ড দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিবে। যখন তোমার ক্রুদ্ধ অথবা দুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন বিচার করিয়া দেখ যে, কোন সংবাদ তোমার নিকট আসিবামাত্র কেমন তোমার মনকে বৃত্তিতে পরিণত করিয়া দিতেছে।

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—যে বৃত্তি শূন্যভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই বৃত্তিই নিদ্রা।

ব্যাখ্যা—আর এক প্রকার বৃত্তির নাম নিদ্রা (স্বপ্ন ও সুষুপ্তি)। আমরা যখন জাগিয়া উঠি, তখন আমরা জানিতে পারি যে, আমরা ঘুমাইতেছিলাম। অনুভূত বিষয়েরই কেবল স্মৃতি হইতে পারে। যাহা আমরা অনুভব করি না, আমাদের সেই বিষয়ের কোন স্মৃতি আসিতে পারে না। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াই চিত্তহ্রদের একটি তরঙ্গ-স্বরূপ। এক্ষণে কথা হইতেছে, নিদ্রায় যদি মনের কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় আমাদের ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক কোন অনুভূতি থাকিত না। সুতরাং আমরা উহা স্মরণও করিতে পারিতাম না। আমরা যে নিদ্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে

পারি, ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিদ্রাবস্থায় মনে এক প্রকার তরঙ্গ ছিল। স্মৃতিও এক প্রকার বৃত্তি।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—অনুভূত বিষয় সমস্ত যখন আমাদের মন হইতে চলিয়া না যায় (যখন সংস্কারবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয়), তাহাকে স্মৃতি বলে। (ইহা দুই প্রকার—ভাবিত ও অনুদ্ভাবিত।)

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে যে চারি প্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি হইতেই স্মৃতি আসিতে পারে। মনে কর, তুমি একটি শব্দ শুনিলে। ঐ শব্দটি যেন চিত্তহ্রদে বিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য; উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ (প্রত্যয়) উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা উৎপাদন করে। ইহাই (গ্রাহ্য রূপ) স্মৃতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যখন নিদ্রা নামক তরঙ্গবিশেষ চিত্তের ভিতর স্মৃতিরূপ অনেক তরঙ্গপরম্পরা উৎপাদন করে, তখন উহাকে স্বপ্ন বলে। জাগ্রৎকালে যাহাকে স্মৃতি বলে, নিদ্রাকালে সেইরূপ তরঙ্গকেই স্বপ্ন বলিয়া থাকে।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়।

ব্যাখ্যা—এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, মন বিশেষরূপ নির্ম্মল, সৎ ও বিচারপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস করিবার আবশ্যক কি? প্রত্যেক কার্য্যই হ্রদের উপরিভাগে কম্পনশীল

প্রবাহস্বরূপ। প্রত্যেক কার্য্যেই যেন চিত্তহ্রদের উপর একটি তরঙ্গ চলিয়া যায়। এই কম্পন কালে নাশ হইয়া যায়। থাকে কি? সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেকগুলি সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্রিত হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। "অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব" এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নহে, উহা প্রথম স্বভাবও বটে—মানুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট রহিয়াছি, তাহা পূর্ব্ব অভ্যাসের ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে, আমাদের মনে সান্ত্বনা আইসে, কারণ যদি আমাদের বর্ত্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা করিলে যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাসকে নাশও করিতে পারি। আমাদের মনের ভিতর যে চিন্তাপ্রবাহগুলি চলিয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি দাগ রাখিয়া যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। আমাদের চরিত্র এই সমুদয় সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। যখন কোন বিশেষ বৃত্তিপ্রবাহ প্রবল হয়, তখন লোকের সেই ভাব হইয়া দাঁড়ায়। যখন সদ্গুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ সৎ হইয়া যায়। যদি মন্দ ভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ হইয়া যায়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে। অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকার—তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা কেবল সৎ অভ্যাসের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। কেবল সৎকার্য্য করিয়া যাও, সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তা

কর; অসৎ সংস্কার নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কখনই বলিও না, অমুকের আর উদ্ধারের আশা নাই। কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকার চরিত্র, যাহা কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, তাহারই পরিচয় দিতেছে। নূতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা ঐগুলিকে দূর করা যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসই কেবল স্বভাবকে সংশোধন করিতে পারে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—ঐ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিবার যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে অভ্যাস বলে।

ব্যাখ্যা—অভ্যাস কাহাকে বলে? মনকে দমন করিবার চেষ্টা অর্থাৎ উহার প্রবাহরূপে বহির্গতি নিবারণ করিবার চেষ্টাই অভ্যাস।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

সূত্রার্থ—দীর্ঘকাল সদা সর্ব্বদা তীব্র শ্রদ্ধার সহিত (সেই পরম-পদ-প্রাপ্তির) চেষ্টা করিলেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—এই সংযম এক দিনে আইসে না, দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস করিলে পর আইসে।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—দৃষ্ট অথবা শ্রুত সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের

আকাঙ্ক্ষা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে একটি অপূর্ব্ব ভাব আইসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয়-বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরাগ্য বা অনাসক্তি বলে। (উহা চারি প্রকার—যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার।)

ব্যাখ্যা—দুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কার্য্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক—(১) আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা, (২) অপরের অনুভূতি। এই দুই শক্তি আমাদের মনোহ্রদে নানা তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে। বৈরাগ্য এ শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তিস্বরূপ। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন—এই কার্য্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক শক্তিদ্বয়কে ত্যাগ করিবার শক্তি লাভ করা। মনে কর, আমি একটি পথ দিয়া যাইতেছি, একজন লোক আসিয়া আমার ঘড়িটি কাড়িয়া লইল। ইহা আমার নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি। ইহা আমি নিজে দেখিলাম। উহা আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ বৃত্তির আকারে পরিণত করিয়া দিল। ঐ ভাব আসিতে দিবে না। যদি উহা নিবারণ করিতে না পার, তবে তোমাতে আছে কি? কিছুই নাই। যদি নিবারণ করিতে পার, তবেই তোমার বৈরাগ্য আছে, বুঝা যাইবে। এইরূপ, সংসারী লোকে যে বিষয়ভোগ করে তাহাতে আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে বিষয়-ভোগই জীবনের চরম লক্ষ্য। এ সকল আমাদের ভয়ানক প্রলোভন-স্বরূপ। ঐগুলিতে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়া ও মনকে উহাদিগকে লইয়া বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই

বৈরাগ্য। স্বানুভূত ও পরানুভূত বিষয় হইতে যে আমাদের দুই প্রকার কার্য্যপ্রবৃত্তি জন্মায়, উহাদিগকে দমন করা ও এইরূপে চিত্তকে উহাদের বশ হইতে না দেওয়াকে বৈরাগ্য বলে। ঐগুলি যেন আমার অধীনে থাকে, আমি যেন উহাদের অধীন না হই। এই প্রকার মনের বলকে বৈরাগ্য বলে—এই বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র উপায়।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—যে তীব্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমরা গুণগুলিতে পর্য্যন্ত বীতরাগ হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা—যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি আসক্তিকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ (অগ্র্যা) বলা যায়। প্রথমে পুরুষ বা আত্মা কী ও গুণগুলিই বা কী, তাহা আমাদের জানা উচিত। যোগ-শাস্ত্রের মতে, সমুদয় প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; ঐ গুণগুলির একটির নাম তমঃ, অপরটি রজঃ ও তৃতীয়টি সত্ত্ব। এই তিন গুণ বাহ্যজগতে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও উহাদের সামঞ্জস্য—এই ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিতে যত বস্তু আছে, সমুদয় প্রপঞ্চই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবায়ে উৎপন্ন। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে নানাপ্রকার তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; মনুষ্যের আত্মা ইহাদের সকলগুলির বাহিরে, প্রকৃতির বাহিরে; উহা স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ; আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্যের প্রকাশ

দেখিতে পাই, তাহার সমুদয়ই প্রকৃতির উপরে আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও প্রকৃতির ভিতরের বস্তু। আমাদের যাহা কিছু চিন্তা, তাহাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিন্তা হইতে অতি স্থূলতম ভূত পর্য্যন্ত সমুদয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত—প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই প্রকৃতি মনুষ্যের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে; যখন প্রকৃতি ঐ আবরণ সরাইয়া লন, তখন আত্মা আবরণমুক্ত হইয়া স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ সূত্রে বর্ণিত এই বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতি বশীভূত হন বলিয়া উহা আত্মার প্রকাশের পক্ষে অতিশয় সাহায্যকারী। পরসূত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাই যোগীর চরম লক্ষ্য।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥

সূত্রার্থ—যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা অনুগত থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সম্যক্ জ্ঞানপূর্ব্বক সমাধি বলে।

ব্যাখ্যা—সমাধি দুই প্রকার। একটিকে সম্প্রজ্ঞাত ও অপরটিকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীকরণের সমুদয় শক্তি আসে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি প্রকার। ইহার প্রথম প্রকারকে সবিতর্ক সমাধি বলে। সকল সমাধিতেই মনকে অন্যান্য বিষয় হইতে সরাইয়া

বিষয়বিশেষের পুনঃ পুনঃ অনুধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় দুই প্রকার। প্রথম, জড়—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও দ্বিতীয়—চেতন পুরুষ। যোগের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। এই সাংখ্যদর্শনের বিষয় তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, 'মন বুদ্ধি অহঙ্কার—ইহাদের এক সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে। উহাকে চিত্ত বলে, চিত্ত হইতেই উহাদের উৎপত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলিকে গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে চিন্তারূপে পরিণত করে।' আবার শক্তি ও ভূত উভয়েরই কারণীভূত এক পদার্থ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই পদার্থটিকে অব্যক্ত বলে—উহা সৃষ্টির প্রাক্কালীন প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থা। উহাতে এক কল্প পরে সমুদয় প্রকৃতিই প্রত্যাবর্ত্তন করে, আবার পরকল্পে উহা হইতে পুনরায় সমুদয় প্রাদুর্ভূত হয়। এই সমুদয়ে অতীত প্রদেশে চৈতন্যঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি। কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ হইলেই আমরা উহার উপর ক্ষমতা লাভ করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। যে প্রকার সমাধিতে বাহ্য স্থূল ভূতগণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। বিতর্ক অর্থে প্রশ্ন—সবিতর্ক অর্থে প্রশ্নের সহিত। যাহাতে ভূতসমূহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি ঐরূপ ধ্যানপরায়ণ পুরুষকে প্রদান করে, যেন এইজন্য ভূতগুলিকে প্রশ্ন

করা,—তাহাকেই সবিতর্ক বলে। কিন্তু শক্তি লাভ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না। উহা কেবল ভোগের জন্য চেষ্টা মাত্র। আর এই জীবনে প্রকৃত ভোগসুখ হইতেই পারে না। ভোগসুখের অন্বেষণ বৃথা, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন উপদেশ; কিন্তু মানুষের পক্ষে ইহা ধারণা করা অতি কঠিন। যখন সে ইহার ধারণা করিতে পারে, তখন সে জগতের অতীত হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহ্যশক্তি বলে, তাহা লাভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু পরিশেষে তাহা হইতে আবার যন্ত্রণারও বৃদ্ধি হয়। অবশ্য, বিজ্ঞানের চক্ষে দৃষ্টি করিয়া পতঞ্জলি এই গুহ্য শক্তিলাভের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সমুদয় শক্তির প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে ভুলেন নাই।

আবার সেই ধ্যানেই যখন ঐ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক করিয়া উহাদিগের স্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখন সেই সমাধিকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে। যখন আর এক সোপান অগ্রসর হইয়া তন্মাত্রগুলিকে ধ্যানের বিষয় করিয়া উহাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে সবিচার সমাধি বলে। আবার ঐ সমাধিতে যখন ঐ সূক্ষ্মভূতগুলিকে দেশকালের অতীত ভাবে লইয়া উহাদের স্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে নির্ব্বিচার সমাধি বলে। ইহার পরবর্ত্তী সোপান এই—ইহাতে সূক্ষ্ম, স্থূল উভয় প্রকার ভূতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণকে ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে রজস্তমোলেশানুবিদ্ধরূপে চিন্তা

করা হয়, তখন উহাকে আনন্দ সমাধি বলে। যখন আমরা অন্তঃকরণকে রজস্তমলেশশূন্য শুদ্ধ সত্ত্বরূপে চিন্তা করি, যখন সমাধি বিশেষ পরিপক্ক হইয়া যায়, যখন স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় ভূতের চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, কেবল সাত্ত্বিক অহঙ্কার মাত্র অন্যান্য বিষয় হইতে পৃথক্কৃত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তখন উহাকে অস্মিতা সমাধি বলে। এ অবস্থায়ও সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা পাইয়াছেন, তাঁহাকে বেদে "বিদেহ" বলিয়া থাকে। তিনি আপনাকে স্থূলদেহশূন্যরূপে চিন্তা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজেকে সূক্ষ্মশরীরধারী বলিয়া চিন্তা করিতে হইবেই হইবে। যাঁহারা এই অবস্থায় থাকিয়া সেই পরমপদ লাভ না করিয়া প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতিলীন বলে; কিন্তু যাঁহারা ঐ প্রকার সূক্ষ্ম ভোগসুখেও সন্তুষ্ট নন, তাঁহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তিলাভ করেন।

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—অন্য প্রকার সমাধিতে সর্ব্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করা হয়, কেবল (ব্যুত্থান-প্রত্যয়হীন) সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ব্যাখ্যা—ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি; ঐ সমাধি আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না—

আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। একজন ব্যক্তি সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে। যতক্ষণ না আত্মা প্রকৃতির অতীতাবস্থায় গিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরও বাহিরে যাইতে পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে। যদিও ইহার প্রণালী খুব সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এই—মনকে ধ্যানের বিষয় করিয়া যখনি তাহাতে কোন চিন্তা আসিবে, তখনি তাহাকে দাবাইয়া দেওয়া। মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আসিতে না দিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য করা। যখনি আমরা ইহা যথার্থরূপে সাধন করিতে পারিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা মুক্তি (পর প্রসংখ্যান) লাভ করিব। পূর্ব্ব সাধন যাঁহারা আয়ত্ত না করিয়াছেন, তাঁহারা যখন মনকে শূন্য করিতে চেষ্টা পান, তখন তাঁহাদের চিত্ত অজ্ঞান-স্বভাব তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের মনকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। তাঁহারা কিন্তু মনে করেন আমরা মনকে শূন্যভাবে ভাবিত করিতেছি। ইহা প্রকৃতরূপে সাধন করিতে সমর্থ হওয়া উচ্চতম শক্তির প্রকাশ—মনকে শূন্য করিতে সমর্থ হইলেই সংযমের চূড়ান্ত হইয়া গেল। যখন এই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়, তখন ঐ সমাধি নির্ব্বীজ হইয়া যায়। সমাধি নির্ব্বীজ হয়, ইহার অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, উহারা সংস্কার বা বীজ আকারে অবশিষ্ট থাকে। আবার সময় আসিলে তাহারা পুনরায় তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন সংস্কারগুলিকে পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করা হয়, যখন মনও

প্রায় বিনষ্ট হইয়া আসে, তখনই সমাধি নির্ব্বীজ হইয়া যায়। তখন মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহা হইতে এই জীবনলতিকা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে—যাহা হইতে এই অবিরাম জন্মমৃত্যুচক্র প্রবাহিত হইতে পারে।

অবশ্য তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, জ্ঞান থাকিবে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থা। যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি, তাহা ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় নিম্নতর অবস্থামাত্র। এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন প্রান্তদ্বয় প্রায় একই প্রকার দেখায়। ইথারের কম্পন মৃদুতম হইলে উহাকে অন্ধকার বলে, আবার উহার উচ্চতম কম্পনও অন্ধকারের ন্যায় দেখায়। কিন্তু ঐ দুই প্রকার অন্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে? উহার একটি—প্রকৃত অন্ধকার, অপরটি—অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহারা দেখিতে একই প্রকার। এইরূপে, অজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নাবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা, আর ঐ জ্ঞানের অতীত (বিজ্ঞানধাতু) একটি উচ্চ অবস্থা আছে। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থা ও জ্ঞানাতীত (নিঃসত্ত্ব নির্জীব) অবস্থা দেখিতে একই প্রকার। আমরা যাঁহাকে জ্ঞান বলি, তাহা এক উৎপন্ন দ্রব্য—উহা একটি মিশ্র পদার্থ, উহা প্রকৃত সত্য নহে। এই উচ্চতর সমাধি ক্রমাগত অভ্যাস করিলে তাহার কি ফল হইবে? উহাতে এই অভ্যাসের পূর্ব্বে আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে মনের যে একটা প্রবণতা ছিল, তাহা ত নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তিরও নাশ হইয়া যাইবে। অপরিষ্কৃত সুবর্ণ হইতে উহার খাদ বাহির করিবার জন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য

মিশাইলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। যখন খনি হইতে উত্তোলিত অপরিষ্কৃত ধাতুকে গলান হয়, তখন যে রাসায়নিক পদার্থগুলি উহার সঙ্গে মিশান হয়, সেগুলি ঐ খাদের সহিত গলিয়া যায়। এই প্রকারেই সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত সমাধি অভ্যাসরূপ সংযম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্ব্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ও পরিশেষে সৎপ্রবৃত্তিগুলিও চলিয়া যাইবে। এইরূপে সদসৎ প্রবৃত্তিদ্বয়ের নিরোধে আত্মা সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া স্ব-মহিমায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ রূপে অবস্থিত থাকিবেন। সুতরাং সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিলেই আমরা সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারি, এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিমান ত্যাগ করিলেই আমরা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া মহাপ্রাণরূপে অবস্থিত হইতে পারি। তখন মানুষ জানিতে পারিবে, কোনকালে তাহার জন্মমৃত্যু ছিল না, তাহার স্বর্গ বা পৃথিবী কখনই কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। সে তখন বুঝিবে, তাহার আসা-যাওয়া কোন কালেই নাই, আসা-যাওয়া কেবল প্রকৃতির। আর প্রকৃতির ঐ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কাচ হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রাচীরের উপর আলোক পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। প্রাচীর নির্ব্বোধের মত ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি। আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ; চিত্তই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহা আপনাকে নানারূপে পরিণত করিতেছে, কিন্তু আমরা মনে করিতেছি, আমরা এই বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসে এই সমুদয় অজ্ঞানই চলিয়া যাইবে। সেই

মুক্ত আত্মা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন—প্রার্থনা বা ভিক্ষুকের মত যাচ্ঞা নয়, কিন্তু আজ্ঞা করিবেন,—তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, তখন তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। সাংখ্যদর্শনের মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এই দর্শন বলেন, জগতের ঈশ্বর কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ যদি তিনি থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা, আর আত্মা বদ্ধ বা মুক্তস্বভাব—এই উভয়ের অন্যতর। যে আত্মা প্রকৃতির বশীভূত, প্রকৃতি যে আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কিরূপে সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি ত নিজেই দাসরূপ। আবার যদি অপর পক্ষ গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ আত্মাকে যদি মুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে এই আপত্তি আসে যে, মুক্ত আত্মা কিরূপে সৃষ্টি ও এই সমুদয় জগতের ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিতে পারেন? উহার কোন বাসনা থাকিতে পারে না, সুতরাং উহার সৃষ্টি ও জগৎশাসনাদি করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই সাংখ্যদর্শন বলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রকৃতি স্বীকার করিলেই যখন সমুদয় ব্যাখ্যা করা যায়, তখন ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি? তবে কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, যাঁহারা সিদ্ধাবস্থার কাছাকাছি যাইয়াও বিভূতিলাভের বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারায় যোগভ্রষ্ট হন। তাঁহাদের মন কিছুদিন প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে; তাঁহারা যখন আবার উৎপন্ন হন, তখন প্রকৃতির

প্রভু হইয়া আসেন। ইঁহাদিগকে যদি ঈশ্বর বল, তবে এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে। আমরা সকলেই এক সময়ে এরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। আর সাংখ্যদর্শনের মতে, বেদে যে ঈশ্বরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ একজন মুক্তাত্মার বর্ণনা মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্যমুক্ত, আনন্দময়, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। আবার এদিকে যোগীরা বলেন, "না, একজন ঈশ্বর আছেন, অন্যান্য সমুদয় আত্মা—সমুদয় পুরুষ হইতে পৃথক একজন বিশেষ পুরুষ আছেন: তিনি সমুদয় সৃষ্টির অনন্ত নিত্য প্রভু, নিত্যমুক্ত, সমুদয় গুরুর গুরুস্বরূপ।" যোগীরা অবশ্য, সাংখ্যেরা যাঁহাদিগকে প্রকৃতিলীন বলেন, তাঁহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যোগভ্রষ্ট যোগী। কিছুকালের জন্য তাঁহাদের চরমলক্ষ্যে গমনের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই সময়ে জগতের অংশবিশেষের অধিপতিরূপে অবস্থিতি করেন।

ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—(সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে) তাহাই দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ।

ব্যাখ্যা—ভারতীয় সমুদয় ধর্ম্মপ্রণালীতে দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে ঐ পদ পূর্ণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই পূর্ণ নহেন।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥২০॥

সূত্রার্থ—অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্য্য অর্থাৎ মনের তেজঃ, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা ও সত্য বস্তুর বিবেক হইতে এই সমাধি উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা দেবত্বপদ অথবা কোন কল্পের শাসনভার প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে। তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—যাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, তাঁহারা অতি শীঘ্রই যোগে কৃতকার্য্য হন।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—আবার মৃদু চেষ্টা, মধ্যম চেষ্টা, অথবা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা—এই অনুসারেই যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ বা ভেদ দেখা যায়।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও (সমাধি লাভ হয়)।

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—এক বিশেষ পুরুষ, যিনি দুঃখ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল অথবা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর (পরম নিয়ন্তা)।

ব্যাখ্যা—আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই; যোগীরা কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিবিধ ভাবের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। যোগীদিগের ঈশ্বর অর্থে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর সূচিত হন নাই, বেদমতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। বেদের অভিপ্রায় এই, জগতে যখন সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্য এক ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ হইবে।

যোগীরা ঈশ্বরাস্তিত্ব-স্থাপনের জন্য এক নূতন ধরনের যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন—

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—অন্যেতে যে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ আছে, তাহা তাঁহাতে নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্ত ভাব ধারণ করে।

ব্যাখ্যা—মনকে অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র এই দুইটি চূড়ান্ত ভাবের ভিতর ভ্রমণ করিতে হইবেই হইবে। তুমি অবশ্য সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে পার, কিন্তু উহা চিন্তা করিতে গেলেই, উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্ত দেশের চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের

বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্ত্তে ঐ ক্ষুদ্র দেশরূপ ক্ষুদ্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহূর্ত্তেই উহার চতুর্দ্দিকে অনন্ত বিস্তৃত আর একটি বৃত্ত রহিয়াছে। কাল সম্বন্ধেও ঐ কথা। মনে কর, তুমি এক সেকেণ্ড সময়ের বিষয় ভাবিতেছ, তৎসঙ্গেসঙ্গেই তোমাকে অনন্ত কালের কথা চিন্তা করিতে হইবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ, মানুষে কেবল জ্ঞানের বীজ-ভাব আছে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন ইহা হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে। যোগীরা সেই অনন্ত জ্ঞানকে ঈশ্বর বলেন।

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব (প্রাচীন) গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কালদ্বারা সীমাবদ্ধ নন।

ব্যাখ্যা—আমাদিগের অভ্যন্তরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বারা উহাকে জাগরিত করিতে হইবে। জানিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে বটে, কিন্তু উহাকে জাগাইতে হইবে। আর যোগীরা বলেন, ঐরূপে জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে। জড়, অচেতন ভূত কখন জ্ঞান বিকাশ করাইতে পারে না—কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞান বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানী

ব্যক্তিগণের সর্ব্বদাই আমাদের নিকট থাকার প্রয়োজন, সুতরাং এই গুরুগণের সর্ব্বদাই প্রয়োজন ছিল। জগৎ কখনও এই সকল আচার্য্যবিরহিত হয় নাই। কোন জ্ঞানই তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত আসিতে পারে না। ঈশ্বর সমুদয় গুরুরও গুরু, কারণ, এই সমস্ত গুরুগণ যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহারা দেবতাই হউন, অথবা স্বর্গদূতই হউন, সকলেই বদ্ধ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর কাল দ্বারা আবদ্ধ নন। যোগীদিগের এই দুইটি বিশেষ সিদ্ধান্ত—প্রথমটি এই যে, সান্ত বস্তুর চিন্তা করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা করিবে। আর যদি ঐ মানসিক অনুভূতির এক ভাগ সত্য হয়, তবে উহার অপর ভাগও সত্য হইবে। কারণ দুইটিই যখন সেই একই মনের অনুভূতি, তখন দুইটি অনুভূতির মূল্যই সমান। মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অল্পজ্ঞ—ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আছে—ঈশ্বর অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। যদি আমরা এই দুইটি অনুভূতির ভিতরে একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ না করিব কেন? যুক্তি ত বলে—হাঁ, উভয়কে গ্রহণ কর, নয়, উভয়কেই পরিত্যাগ কর। যদি আমি বিশ্বাস করি যে, মানব অল্পজ্ঞানসম্পন্ন, তবে আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে একজন অসীমজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালের দার্শনিকগণ যে বলিয়া থাকেন, মানুষের জ্ঞান তাহার আপনার ভিতর হইতে উৎপন্ন হয়—এ কথা সত্য বটে, সমুদয়

জ্ঞানই মানুষের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য কতকগুলি অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন। আমরা গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এক্ষণে কথা হইতেছে, যদি মনুষ্য, দেব অথবা স্বর্গবাসী দূতবিশেষ আমাদের গুরু হন, তাহা হইলে তাঁহারা ত সকলেই সসীম; তাঁহাদের পূর্ব্বে তাঁহাদের আবার গুরু কে ছিলেন? আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবেই হইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অবিচ্ছিন্ন নহেন। সেই এক অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন গুরু, যাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলে।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার তাঁহার প্রকাশক।

ব্যাখ্যা—তোমার মনে যে কোন ভাব আছে, তাহারই এক প্রতিরূপ শব্দও আছে; এই শব্দ ও ভাবকে পৃথক করা যায় না। একই বস্তুর বাহ্যভাগটিকে শব্দ ও তাহারই অন্তর্ভাগটিকে চিন্তা বা ভাব আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন মনুষ্যই বিশ্লেষণবলে চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক করিতে পারে না। কতকগুলি লোক একত্রে বসিয়া কোন্ ভাবের জন্য কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির করিতে করিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ অনেকের মত; কিন্তু এই মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যতদিন মানুষ রহিয়াছে, ততদিন শব্দ ও ভাষা উভয়েরই অস্তিত্ব রহিয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, একটি ভাব ও

একটি শব্দে পরস্পর সম্বন্ধ কি? আমরা যদিও দেখিতে পাই যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্দ থাকা চাই-ই চাই, কিন্তু এক ভাব যে একটি মাত্র শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইবে, তাহা নহে। কুড়িটি বিভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্য একটি না একটি শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই একভাব-প্রকাশক শব্দগুলিকে যে এক প্রকার উচ্চারণবিশিষ্ট হইতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণবিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করিবে। সেই জন্য টীকাকার বলিয়াছেন যে, "যদিও ভাব ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব্দ ও এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয়. সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বুঝাইতেছে না।"* এই সমস্ত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক। যদি বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে বলা যায়, তাহা না হইলে সে বাচক শব্দ কথনই সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারে না। বাচক বাচ্য-পদার্থের প্রকাশক। যদি সে বাচ্য বস্তুর পূর্ব্ব হইতে অস্তিত্ব থাকে, আর আমরা যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাদ্বারা দেখিতে পাই যে, ঐ বাচক শব্দটি ঐ বস্তুকে অনেক বার

* সর্ব্বে এব শব্দাঃ সর্ব্বাকারার্থাভিধানসমর্থা—ইতি স্থিত এবৈষাং সর্ব্বাকারৈরর্থৈঃ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ।

—ব্যাসভাষ্যের বাচস্পতিমিশ্রকৃত টীকা

বুঝাইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ বাচ্য-বাচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে। যদি ঐ পদার্থগুলি উপস্থিত না থাকে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি উহাদের বাচকের দ্বারাই উহাদের জ্ঞান লাভ করিবে। বাচ্য ও বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা অবশ্যম্ভাবী; অতএব যখন ঐ বাচক শব্দটি উচ্চারণ করা হইবে, তখনই উহা ঐ বাচ্য-পদার্থটির কথা মনে উদ্রেক করিয়া দিবে। সূত্রকার বলিতেছেন, ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক। সূত্রকার বিশেষভাবে 'ওঁ' এই শব্দটির উল্লেখ করিলেন কেন? "ঈশ্বর" এই ভাবটি বুঝাইবার জন্য ত শত শত শব্দ রহিয়াছে। একটি ভাবের সহিত সহস্র সহস্র শব্দের সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বর ভাবটি শত শত শব্দের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই ত ঈশ্বরের বাচক। ভাল, তাহাই হইল; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ শব্দগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির করা চাই। ঐ সমুদয় বাচকগুলির একটি সাধারণ শব্দ-ভূমি বাহির করিতে হইবে—আর যে বাচক শব্দটি সকলের সাধারণ বাচক হইবে, সেই বাচক শব্দটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইবে, আর সেইটিই বাস্তবিক উহার যথার্থ বাচক হইবে। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, আমরা কণ্ঠনালী ও তালুকে শব্দোচ্চারণাধাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি কোন ভৌতিক শব্দ আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার প্রকাশস্বরূপ—যাহা স্বভাবতঃই অন্য সমুদয় শব্দগুলিকে বুঝাইতে পারে? ওঁ—এই শব্দই এই প্রকার; উহাই সমুদয়

শব্দের ভিত্তি-স্বরূপ। উহার প্রথম অক্ষর 'অ' সমুদয় শব্দের মূল—উহাই সমুদয় শব্দের কুঞ্চিকাস্বরূপ, উহা জিহ্বা অথবা তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয়। 'ম'—বর্গীয় সমুদয় শব্দের শেষ শব্দ, উহার উচ্চারণ করিতে হইলে ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিতে হয়। আর 'উ' এই শব্দ জিহ্বামূল হইতে মুখমধ্যবর্ত্তী শব্দাধারের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যেন গড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে 'ওঁ' শব্দটির দ্বারা সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে উহাই স্বাভাবিক বাচক শব্দ—উহাই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-স্বরূপ। যত প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে—আমাদের ক্ষমতায় যত প্রকার শব্দ উচ্চারণের সম্ভাবনা আছে, উহা তৎসমুদয়ের সূচক। এই সকল আনুমানিক গবেষণা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মভাব আছে, এই ওঙ্কার সকলগুলিরই কেন্দ্রস্বরূপ, বেদের বিভিন্ন ধর্ম্মভাবসমূহ এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ আছে? ইহার উত্তর এই—সর্ব্বদেশে এই ওঙ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে; তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যতরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, ওঙ্কার তাহার প্রত্যেক সোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাস্তিকগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের উচ্চতম আদর্শ-প্রকাশের জন্য এই ওঙ্কার অবলম্বন

করিয়াছিলেন। সুতরাং কার্য্যতঃ যখন এই ওঙ্কার মানব-জাতির অধিকাংশের ধর্ম্মভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, তখন সকল দেশের সকল জাতিই উহা অবলম্বন করিতে পারেন। ইংরেজী 'গড' শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা বড় বেশী দূর যাইতে পারে না। যদি তুমি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে উহাতে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—যেমন সগুণ (Personal), নির্গুণ (Impersonal), নির্ব্বিশেষ (Absolute) ইত্যাদি। অন্য সমুদয় ভাষাতেই ঈশ্বরবাচক যে সকল শব্দ আছে, তৎসম্বন্ধেও এই কথা খাটে; উহাদের অতি অল্প-ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু 'ওঁ' এই শব্দে এই সর্ব্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে। অতএব, উহা সর্ব্বসাধারণের গ্রহণ করা আবশ্যক।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান (সমাধিলাভের উপায়)।

ব্যাখ্যা—এক্ষণে কথা হইতেছে, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের আবশ্যকতা কি? অবশ্য, আমাদের সংস্কারবিষয়ক মতবাদের কথা স্মরণ আছে; সমুদয় সংস্কারসমষ্টিই আমাদের মনোমধ্যে অবস্থিত আছে। সংস্কারগুলি মনের মধ্যে বাস করে; তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না, উহারা মনের মধ্যেই অবস্থিত থাকে;

উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই উহারা ব্যক্তভাব ধারণ করে। আণবিক কম্পন কখনই নিবৃত্ত হইবে না। যখন এই সমুদয় জগৎ নাশ হইবে, তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্পন বা প্রবাহ সমুদয়ই চলিয়া যাইবে; সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী সকলই লয় হইয়া যাইবে; কিন্তু পরমাণুগুলির মধ্যে যে কম্পন ছিল তাহা থাকিবে। এই বৃহৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে কার্য্য হইতেছে, প্রত্যেক পরমাণু সেই কার্য্য সাধন করিবে। বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে যেরূপ কথিত হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও তদ্রূপ। চিত্তের অভ্যন্তরস্থ কম্পনসমুদয় অপ্রকাশ হইবে বটে, কিন্তু পরমাণু-কম্পনের ন্যায় তাহাদের সূক্ষ্ম গতি অব্যাহত থাকিবে, তাহারা উত্তেজক কারণ পাইলেই পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের অর্থ এক্ষণে বুঝা যাইবে। আমাদের ভিতর যে সকল ধর্ম্মের সংস্কার আছে, ইহা সেইগুলিকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিবার প্রধান সহায়। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥" (শংকরকৃত মোহমুদ্গর, ৫)। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ ভবসমুদ্র-পারের একমাত্র নৌকাস্বরূপ হয়। সৎসঙ্গের এতদূর শক্তি! বাহ্য সৎসঙ্গের যেমন শক্তি কথিত হইল, তেমনি আন্তরিক সৎসঙ্গও আছে। এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ করা। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর এবং তৎসঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহা হইলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক আসিবে ও আত্মা প্রকাশিত হইবেন।

কিন্তু যেমন 'ওঁ' এই শব্দের চিন্তা করিতে হইবে, তৎসঙ্গে উহার অর্থেরও চিন্তা করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর,

কারণ, পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে; এই অসৎসঙ্গরূপ তাপ যেই উহার উপর প্রযুক্ত হয়, অমনিই আবার সেই ক্ষত পূর্ব্ব-বিক্রমে আসিয়া দেখা দেয়। এই উদাহরণের দ্বারাই বোধগম্য হইবে যে, আমাদের ভিতরে যে সকল উত্তম সংস্কার আছে, সেগুলি এক্ষণে অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু উহারা আবার সৎসঙ্গের দ্বারা জাগরিত হইবে—ব্যক্তভাব ধারণ করিবে। সৎসঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিত্রতর কিছু নাই, কারণ, সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলির জাগরিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়—ঐগুলি চিত্তহ্রদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আসিবার উপক্রম করে।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥

সূত্রার্থ—উহা হইতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় ও যোগবিঘ্ন-সমূহ নাশ হয়।

ব্যাখ্যা—এই ওঙ্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল এই দেখিবে যে, ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত এবং মানসিক ও শারীরিক যোগবিঘ্নসমুদয় দূরীভূত হইতে থাকিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই যোগবিঘ্নগুলি কি কি?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥৩০॥

সূত্রার্থ—রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্যম-রাহিত্য, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা

লাভ না করা, ঐ অবস্থা লাভ হইলেও তাহা হইতে পতিত হওয়া—এইগুলিই চিত্তবিক্ষেপের অন্তরায়।

ব্যাখ্যা—ব্যাধি—এই জীবন-সমুদ্রের অপর পারে যাইতে হইলে, এই শরীরই উহা পার হইবার একমাত্র নৌকা। ইহাকে সুস্থ রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অসুস্থশরীরিগণ যোগী হইতে পারে না। মানসিক জড়তা আসিলে, আমাদের যোগবিষয়ক প্রবল অনুরাগ নষ্ট হইয়া যায়। উহার অভাবে সাধন করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহার কিছুই থাকে না। আমাদের এই বিষয়ে বিচারজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক না কেন, যতদিন দূরদর্শন, দূরশ্রবণাদি অলৌকিক অনুভূতি না আসিবে, ততদিন এই বিদ্যার সত্যতা বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিবে। যখন এই সকলের একটু একটু আভাস আসিতে থাকে, তখন মনও খুব দৃঢ় হইতে থাকে, তাহাতে ঐ সাধককে সাধনপথে আরও অধ্যবসায়শীল করিয়া তুলে। অনবস্থিতত্ব—কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাধন করিবার সময় দেখিবে, মন বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে; বোধ হইতেছে, তুমি সাধনপথে শীঘ্র শীঘ্র খুব উন্নতি করিতেছ। একদিন দেখিবে, হঠাৎ তোমার এই উন্নতিস্রোত বন্ধ হইয়া গেল। তুমি দেখিলে যেন হঠাৎ একদিন তোমার সমুদয় উন্নতিস্রোত বন্ধ হইয়া, যেমন জাহাজ চড়ায় সংলগ্ন হইলে চলনরহিত হয়, সেইরূপ হইল। এইরূপ হইলেও অধ্যবসায়শূন্য হইও না। এইরূপে বারবার উঠা-পড়া হইতেই ক্রমে উন্নতিলাভ হইয়া থাকে।

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা-
বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—দুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, (অঙ্গম্+এজয়ত্ব। √এজ্ কম্পনে) অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস, এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—যখনই যখনই একাগ্রতা অভ্যাস করা যায়, তখন তখনই মন ও শরীর সম্পূর্ণ স্থিরভাব ধারণ করে। যখন ঠিক পথে সাধনা না হয়, অথবা যখন চিত্ত রীতিমত সংযত না থাকে, তখনই এই বিঘ্নগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। ওঙ্কার জপ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ হইতেই মন দৃঢ় হয় ও নূতন বল আসে। সাধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ স্নায়বীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ওদিকে খেয়াল না করিয়া সাধন করিয়া যাও। সাধনের দ্বারাই ওগুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—ইহা নিবারণের জন্য এক-তত্ত্ব (ঈশ্বর বা স্থূলাদি বা অভিমত তত্ত্ব) অভ্যাসের আবশ্যক।

ব্যাখ্যা—কিছুক্ষণের জন্য মনকে কোন বিষয়বিশেষের আকারে আকারিত করিবার চেষ্টা করিলে পূর্বোক্ত বিঘ্নগুলি চলিয়া যায়। এই উপদেশটি খুব সাধারণ ভাবে দেওয়া হইল। পর সূত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে ও বিশেষ বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে এই সাধারণ উপদেশের প্রয়োগ উপদিষ্ট হইবে। এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটিতে

পারে না, এই জন্য নানাপ্রকার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা করিয়া কোন্‌টি তাঁহার পক্ষে খাটে, দেখিয়া লইতে পারেন।

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যা-
পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ এই কয়েকটি ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষা এই কয়েকটি ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্যক। আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের প্রতি দয়াবান হওয়া, লোককে সৎকর্ম্ম করিতে দেখিলে সুখী হওয়া এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এইরূপ যত কিছু বিষয় আমাদের সম্মুখে আসে, সেই-গুলির প্রতিও আমাদের এই এই ভাব ধারণ করা আবশ্যক। যদি বিষয়টি সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি বন্ধু অর্থাৎ অনুকূল ভাব ধারণ করা আবশ্যক। এইরূপ, যদি কোন দুঃখকর ঘটনা আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ উহার প্রতি করুণভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষয় হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া আবশ্যক আর অসৎ বিষয় হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই এই রূপ ভাবদ্বারা মন শান্ত হইয়া যাইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ গোলযোগ

ও অশান্তির কারণ, মনকে ঐ-ঐরূপভাবে ধারণ করিবার অক্ষমতা। মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিল, অমনি আমি তাহার প্রতীকার করিতে উদ্যত হইলাম। আর আমরা যে কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ না লইয়া থাকিতে পারি না তাহার কারণ এই যে, আমরা চিত্তকে থামাইয়া রাখিতে পারি না। উহা ঐ পদার্থের প্রতি প্রবাহাকারে ধাবমান হয়; আমরা তখন মনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। আমাদিগের মনে ঘৃণা অথবা অপরের অনিষ্টকরণ-প্রবৃত্তি-রূপ যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা শক্তির ক্ষয়মাত্র। আর কোন অশুভ চিন্তা অথবা ঘৃণাপ্রসূত কার্য্য অথবা কোন প্রকার প্রতি-ক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহা হইতে শুভকরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত থাকিবে। এইরূপ সংযমের দ্বারা আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয় তাহা নহে, বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে। যখনই আমরা ঘৃণা অথবা ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহা আমাদের অনুকূল শুভশক্তিস্বরূপ সঞ্চিত হইয়া উচ্চতর শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—শ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া ও ধারণ দ্বারাও (চিত্ত স্থির হয়)।

ব্যাখ্যা—এ স্থানে অবশ্য প্রাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নহে। সমুদয় জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত

রহিয়াছে, তাহারই নাম প্রাণ। জগতের যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করে, যাহা কিছু কার্য্য করিতে পারে, অথবা যাহার জীবন আছে, তাহাই এই প্রাণের বিকাশ। সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার সমষ্টিকে প্রাণ বলে। যুগোৎপত্তির প্রাক্কালে এই প্রাণ প্রায় একরূপ গতিহীন অবস্থায় অবস্থান করে, আবার যুগপ্রারম্ভকালে প্রাণ ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই মনুষ্যজাতি অথবা অন্যান্য প্রাণীতে স্নায়বীয় গতিরূপে প্রকাশিত, আবার ঐ প্রাণই চিন্তা ও অন্যান্য শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। সমুদয় জগৎ এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি। মনুষ্যদেহও ঐরূপ; যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সমুদয় পদার্থই আকাশ হইতে উৎপন্ন, আর প্রাণ হইতেই সমুদয় বিভিন্ন শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ করা ও উহার ধারণ করার নামই প্রাণায়াম। যোগশাস্ত্রের পিতাস্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী অন্যান্য যোগীরা এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া উহাকেই একটি মহতী বিদ্যা করিয়া তুলিয়াছেন। পতঞ্জলির মতে ইহা চিত্তবৃত্তিনিরোধের বিভিন্ন উপায়-সমূহের মধ্যে অন্যতম উপায় মাত্র, কিন্তু তিনি ইহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। তাঁহার ভাব এই যে, শ্বাস খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া আবার ভিতরে টানিয়া লইবে এবং কিছুক্ষণ উহা ধারণ করিয়া রাখিবে, তাহাতে—মন অপেক্ষাকৃত

একটু স্থির হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ইহা হইতেই প্রাণায়াম নামক বিশেষ বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। এই পরবর্ত্তী যোগিগণ কি বলেন, আমাদের তৎসম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই কিছু বলা হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলে তোমাদের মনে রাখিবার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, এই প্রাণ বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না; যে শক্তিবলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি হয়, যে শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রাণস্বরূপ, তাহাকে প্রাণ বলে। আবার এই প্রাণশব্দ সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলির নামরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমুদয়কেই প্রাণ বলে। মনকেও আবার প্রাণ বলে। অতএব দেখা গেল যে, প্রাণ অর্থ শক্তি। তথাপি ইহাকে আমরা শক্তি নাম দিতে পারি না, কারণ শক্তি ঐ প্রাণের বিকাশস্বরূপ। ইহাই শক্তি ও নানাবিধ গতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। চিত্ত যন্ত্রস্বরূপ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া এই প্রাণ হইতেই শরীররক্ষার কারণীভূত ভিন্ন ভিন্ন জীবনী-শক্তি এবং চিন্তা, ইচ্ছা ও অন্যান্য সমুদয় শক্তি উৎপন্ন করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়াম ক্রিয়াদ্বারা আমরা শরীরের সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের অন্তর্গত সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলিকে বশে আনিতে পারি। আমরা প্রথমতঃ ঐগুলিকে উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার করি, পরে অল্পে অল্পে উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করি—উহাদিগকে বশীভূত করিতে কৃতকার্য্য হই। পতঞ্জলির পরবর্ত্তী যোগী-দিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ আছে।

একটিকে তাঁহারা ইড়া, অপরটিকে পিঙ্গলা ও তৃতীয়টিকে সুষুম্না বলেন। তাঁহাদের মতে, পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ দিকে, ইড়া বামদিকে, আর ঐ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে সুষুম্নানাম্নী শূন্য নালী আছে। তাঁহাদের মতে, ইড়া ও পিঙ্গলা নামক শক্তিপ্রবাহদ্বয় প্রত্যেক মনুষ্যমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, উহাদের সাহায্যেই আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। সুষুম্নার কার্য্য সকলের মধ্যেই সম্ভব বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কেবল যোগীর শরীরেই উহার মধ্য দিয়া কার্য্য হইয়া থাকে। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যোগী যোগসাধনবলে আপনার দেহকে পরিবর্ত্তিত করেন। তুমি যতই সাধন করিবে, ততই তোমার দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে; সাধনের পূর্ব্বে তোমার যেরূপ শরীর ছিল, পরে আর তাহা থাকিবে না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নহে; ইহা যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা যে কিছু নূতন চিন্তা করি, তাহাই আমাদের মস্তিষ্কে একটি নূতন প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, মনুষ্যস্বভাব এত স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন; মনুষ্যস্বভাবই এই যে, উহা পূর্ব্বাবর্ত্তিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, কারণ উহা অপেক্ষাকৃত সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি মনে করা যায়, মন একটি সূচিকাস্বরূপ আর মস্তিষ্ক উহার সম্মুখে একটি কোমল পিণ্ডমাত্র, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই মস্তিষ্কমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, আর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ধূসর পদার্থটি যদি ঐ পথটির চারিধারে

এক সীমা প্রস্তুত করিয়া না দেয়, তাহা হইলে ঐ পথটি বন্ধ হইয়া যায়। যদি ঐ ধূসরবর্ণ পদার্থটি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের স্মৃতিই সম্ভব হইত না, কারণ স্মৃতি' অর্থ, পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি পূর্ব্ব চিন্তার উপর দাগা বুলান। হয়ত তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, যখন আমি সর্ব্বপরিচিত কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া ঐগুলিরই ঘোরফের করিয়া কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা সহজেই আমার কথা বুঝিতে পার; ইহার কারণ আর কিছুই নয়—এই চিন্তার পথ বা প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে, কেবল ঐগুলিতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়, এই মাত্র। কিন্তু যখনই কোন নূতন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসে, তখনই মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালীর নির্ম্মাণ আবশ্যক হয়; এই জন্য তত সহজে উহা বুঝা যায় না। এই জন্যই মস্তিষ্ক—মানুষেরা নয়, মস্তিষ্কই—অজ্ঞাতসারে এই নূতন প্রকার ভাবদ্বারা পরিচালিত হইতে অস্বীকার করে। উহা যেন সবলে এই নূতন প্রকার ভাবের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। প্রাণ নূতন নূতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মস্তিষ্ক তাহা করিতে দিতেছে না। মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত পক্ষপাতী, তাহার গুহ্য কারণ ইহাই। মস্তিষ্কের মধ্যে এই প্রণালীগুলি যত অল্প পরিমাণে আছে, আর প্রাণরূপ সূচিকা উহার ভিতর যত অল্পসংখ্যক পথ প্রস্তুত করিয়াছে, মস্তিষ্ক ততই স্থিতিশীলতাপ্রিয় হইবে, ততই উহা নূতন প্রকার চিন্তা ও ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। মানুষ যতই চিন্তাশীল

হয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পথগুলি ততই অধিক জটিল হইবে, ততই সহজে সে নূতন নূতন ভাবগ্রহণ করিবে ও তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেক নূতন ভাব সম্বন্ধে এইরূপ জানিবে। মস্তিষ্কে একটি নূতন ভাব আসিলেই মস্তিষ্কের ভিতর নূতন প্রণালী নির্ম্মিত হইল। এই জন্য যোগঅভ্যাসের সময় আমরা প্রথমে এত শারীরিক বাধা প্রাপ্ত হই। কারণ যোগ সম্পূর্ণরূপে কতকগুলি নূতনপ্রকার চিন্তা ও ভাবসমষ্টি। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মের যে অংশ প্রকৃতির জাগতিক ভাব লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে, তাহা সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হয়, আর উহার অপরাংশ অর্থাৎ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, যাহা কেবল মনুষ্যের আভ্যন্তরীণ ভাগ লইয়া ব্যাপৃত, তাহা সাধারণতঃ লোকে তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। আমাদের এই জগতের লক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক; জগৎ আমাদের জ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত অনন্ত সত্তামাত্র। অনন্তের কিয়দংশ আমাদের জ্ঞানের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই আমরা আমাদের জগৎ বলিয়া থাকি। তাহা হইলেই দেখা গেল যে, জগতের অতীত প্রদেশে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। ধর্ম্ম এই উভয় বিষয়ক হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এই ক্ষুদ্রপিণ্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, আর জগতের অতীত অনন্ত সত্তা—এই উভয়ই ধর্ম্মের বিষয়। যে ধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্ম্ম এই উভয়-বিষয়ক হওয়াই আবশ্যক। অনন্তের যে ভাগ আমাদিগের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি,

যাহা দেশকালনিমিত্তরূপ চক্রের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, ধর্ম্মের যে অংশ ইহার বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তাহা আমাদের সহজে বোধগম্য হয়, কারণ, আমরা ত পূর্ব্ব হইতেই উহার বিষয় জ্ঞাত আছি, আর এই জগতের ভাব একরূপ স্মরণাতীত কাল হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু উহার যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তাহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, সেইজন্য উহার চিন্তায় মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই যেন উলটিয়া পালটিয়া যায়; সেইজন্য সাধন করিতে গিয়া সাধারণ লোকে প্রথমটা যেন আমাদের চিরাভ্যস্ত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। যথাসম্ভব এই বিঘ্ন-বাধাগুলি যাহাতে না আসে, তজ্জন্যই পতঞ্জলি এই সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে আমরা উহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া যেটি আমাদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী এমন যে কোন একটি সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে পারি।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না
মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—যে সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইন্দ্রিয়বিষয়ের অনুভূতি হয়, তাহারা মনের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ইহা ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই আপনা আপনি আসিতে থাকে; যোগীরা বলেন, যদি নাসিকাগ্রে মন

একাগ্র করা যায়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত সুগন্ধ অনুভব করা যায়। জিহ্বামূলে মনকে এইরূপে একাগ্র করিলে, সুন্দর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ করিলে দিব্য রসাস্বাদ হয়, জিহ্বামধ্যে সংযম করিলে বোধ হয় যে, যেন কি এক বস্তু স্পর্শ করিলাম। তালুতে সংযম করিলে দিব্যরূপ-সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি এই যোগের কিছু সাধন অবলম্বন করিয়াও উহার সত্যতায় সন্দিহান হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর এই সকল অনুভূতি হইতে থাকিলে আর তাহার সন্দেহ থাকিবে না, তখন সে অধ্যবসায়সহকারে সাধন করিতে থাকিবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—শোকরহিত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের (বিষয়বতী হার্দ্দাকাশ অথবা অস্মিতা) ধ্যানের সমাধি হয়।

ব্যাখ্যা—ইহা আর এক প্রকার সমাধি। এইরূপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন এক পদ্ম রহিয়াছে; তাহার কর্ণিকা অধোমুখী; উহার মধ্য দিয়া সুষুম্না গিয়াছে। তৎপরে পূরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর যে, ঐ পদ্ম কর্ণিকার সহিত ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে, আর ঐ পদ্মের মহাজ্যোতিঃ রহিয়াছে। ঐ জ্যোতির ধ্যান কর।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ—অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্দ্রিয়বিষয়ে

আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—কোন সাধুপুরুষের কথা ধর। কোন মহাপুরুষ, যাঁহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, যাঁহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বলিয়া জান, তাঁহার হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর। তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছে (নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছ ও প্রশান্ত), সুতরাং তাঁহার অন্তরের বিষয় চিন্তা করিলে তোমার অন্তঃকরণ শান্ত হইবে। ইহা যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর এক উপায় আছে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—অথবা স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন যে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার এবং সুষুপ্তি-অবস্থায় লব্ধ সাত্ত্বিক সুখের ধ্যান করিলেও (চিত্ত প্রশান্ত হয়)।

ব্যাখ্যা—কখন কখন লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেবতারা আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সে যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে, সে তাহা শুনিতেছে। ঐ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের ভাবে থাকে। জাগরণের পর ঐ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ স্বপ্নটিকে সত্য বলিয়া চিন্তা কর, উহার

ধ্যান কর। তুমি যদি ইহাতেও সমর্থ না হও, তবে যে কোন পবিত্র বস্তু তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—অথবা যে কোন জিনিস তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহারই ধ্যান দ্বারা (সমাধি লাভ হয়)।

ব্যাখ্যা—অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, কোন অসৎ বিষয় ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু যে কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাস—যে কোন স্থান তুমি খুব ভালবাস, যে কোন দৃশ্য তুমি খুব ভালবাস, যে কোন ভাব তুমি খুব ভালবাস, যাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর।

পরমাণু-পরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে পর্য্যন্ত তাঁহার মন অব্যাহত-গতি হয়।

ব্যাখ্যা—মন এই অভ্যাসের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম হইতে বৃহত্তম বস্তু পর্য্যন্ত সহজে ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই এই মনোবৃত্তি-প্রবাহগুলিও ক্ষীণতর হইয়া আসে।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষু
তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—যে যোগীর চিত্তবৃত্তিগুলি এইরূপ ক্ষীণ হইয়া যায় (বশে আসে), তাঁহার চিত্ত তখন, যেমন শুদ্ধ স্ফটিক (ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত বস্তুর সম্মুখে তৎসদৃশ আকার ধারণ করে), সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বস্তুতে (অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ্য বস্তুতে) একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি ফল লাভ হয়? আমাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, পূর্ব্বের এক সূত্রে পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমাধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম সমাধি স্থূল বিষয় লইয়া, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া; পরে ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বস্তু আমাদের সমাধির বিষয় হয়, তাহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই সকল সমাধির অভ্যাস দ্বারা স্থূলের ন্যায় সূক্ষ্ম বিষয়ও আমরা সহজে ধ্যান করিতে পারি। এই অবস্থায় যোগী তিনটি বস্তু দেখিতে পান—গ্রহীতা, গ্রাহ্য ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় ও মন। তিন প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ, স্থূল, যথা—শরীর বা ভৌতিক পদার্থসমুদয় (বিশ্বভেদ)। দ্বিতীয়তঃ, সূক্ষ্ম বস্তুসমুদয়, যথা—মন বা চিত্তাদি। তৃতীয়তঃ, গুণ-বিশিষ্ট পুরুষ (ঈশ্বর বা মুক্ত) অথবা অস্মিতা বা অহঙ্কার। এখানে আত্মা বলিতে উহার যথার্থ স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। অভ্যাসের দ্বারা যোগী এই সমুদয় ধ্যানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার এতাদৃশী একাগ্রতা-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি

ধ্যান করেন, তখনই অন্যান্য সমুদয় বস্তুকে মন হইতে সরাইয়া দিতে পারেন। তিনি যে বিষয় ধ্যান করেন, সে বিষয়ের সহিত এক হইয়া যান (তৎস্থিতভা ও তদঞ্জনতা); যখন তিনি ধ্যান করেন, তিনি যেন একখণ্ড স্ফটিকতুল্য হইয়া যান; পুষ্পের নিকট স্ফটিক থাকিলে, ঐ স্ফটিক যেন পুষ্পের সহিত একরূপ একীভূত হইয়া যায়। যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্ফটিকটিও লোহিত দেখায়, যদি পুষ্পটি নীলবর্ণবিশিষ্ট হয়, তবে স্ফটিকটিও নীলবর্ণবিশিষ্ট দেখায়।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—শব্দ, অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞান যখন মিশ্রিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কযুক্ত সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

ব্যাখ্যা—এখানে শব্দ অর্থে কম্পন। অর্থ অর্থে যে স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ উহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর জ্ঞান অর্থে প্রতিক্রিয়া। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার সমাধির কথা শুনিলাম, পতঞ্জলি এ সকলগুলিকেই সবিতর্ক বলেন। ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ সমাধির কথা বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধিগুলিতে আমরা বিষয়ী ও বিষয়—এই দুইটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখিয়া থাকি; উহা শব্দ, উহার অর্থও তৎপ্রসূত জ্ঞানমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। প্রথম বাহ্যকম্পন—শব্দ; উহা ইন্দ্রিয়প্রবাহদ্বারা ভিতরে প্রবাহিত

হইলে তাহাকে অর্থ বলে। তৎপরে চিত্তে এক প্রতি-ক্রিয়াপ্রবাহ আসে, উহাকে জ্ঞান বলা যায়। যাহাকে আমরা বাহ্যবস্তুর অনুভূতি বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটির সমষ্টি (সংকীর্ণ) মাত্র। আমরা এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সমাধির কথা পাইয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই এই সমষ্টিই আমাদের ধ্যেয়। ইহার পরে যে সমাধির কথা বলা হইবে, তাহা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ—যখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক থাকে না, যখন উহা কেবল ধ্যেয় বস্তুর অর্থমাত্র প্রকাশ করে, তাহাই নির্ব্বিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশূন্য সমাধি।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, এই তিনটির একত্রে অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় আসে, যখন উহারা আর মিশ্রিত হয় না, তখন আমরা অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। এক্ষণে প্রথমতঃ এই তিনটি কি, আমরা তাহা বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। এই চিত্ত রহিয়াছে, পূর্ব্বের সেই হ্রদের উপমার কথা স্মরণ কর, হ্রদকে মনস্তত্ত্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, আর শব্দ বা বাক্য অর্থাৎ বস্তুর কম্পন যেন উহার উপর একটি প্রবাহের ন্যায় আসিতেছে। তোমার

নিজের মধ্যেই ঐ স্থির হ্রদ রহিয়াছে। মনে কর, আমি ‘গো’ এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম। যখনই উহা তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তৎসঙ্গেই তোমার চিত্তহ্রদে একটি প্রবাহ উত্থিত হইল। ঐ প্রবাহটিই ‘গো’ এই শব্দ-সূচিত ভাব বা অর্থ। তুমি যে মনে করিয়া থাক, আমি একটি ‘গো’কে জানি, উহা কেবল তোমার মনোমধ্যস্থ একটি তরঙ্গমাত্র। উহা বাহ্য ও আভ্যন্তর শব্দপ্রবাহের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহটিও নাশ হইয়া যায়। একটি বাক্য বা শব্দ ব্যতীত প্রবাহ থাকিতে পারে না। অবশ্য, তোমার মনে এরূপ উদয় হইতে পারে যে, যখন কেবল ‘গো’টির বিষয় চিন্তা কর অথচ বাহির হইতে কোন শব্দ কর্ণে না আসে, তখন শব্দ থাকে কোথায়? তখন ঐ শব্দ তুমি নিজে নিজেই করিতে থাক। তুমি তখন নিজের মনে মনেই ‘গো’ এই শব্দটি আস্তে আস্তে বলিতে থাক, তাহা হইতেই তোমার অন্তরে একটি প্রবাহ আসিয়া থাকে। শব্দের উত্তেজনা ব্যতীত কোন প্রবাহ আসিতে পারে না; আর যখন বাহির হইতে ঐ উত্তেজনা না আসে, তখন ভিতর হইতেই উহা আসে। আর যখন শব্দটি থাকে না, তখন প্রবাহটিও থাকে না। তখন কি অবশিষ্ট থাকে? তখন ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। উহাই জ্ঞান। এই তিনটি আমাদের মনে এত দৃঢ়সম্বদ্ধ রহিয়াছে যে, আমরা উহাদিগকে পৃথক করিতে পারি না। যখনই শব্দ আসে, তখনই ইন্দ্রিয়গণ কম্পিত হইয়া থাকে, আর প্রবাহসকল

প্রতিক্রিয়াস্বরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহারা একটির পর আর একটি এত শীঘ্র আসিয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে একটি হইতে আর একটিকে বাছিয়া লওয়া অতি দুর্ঘট; এখানে যে সমাধির কথা বলা হইল, তাহা দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে পর সমুদয় সংস্কারের আধারভূমি স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই আমরা উহাদের মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করিতে পারি, ইহাকেই নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে।

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ
সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে যে সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক সমাধিদ্বয়ের কথা বলা হইল, তদ্দ্বারাই সবিচার ও নির্ব্বিচার উভয় প্রকার সমাধি, যাহাদের বিষয় সূক্ষ্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল।

ব্যাখ্যা—এখানে পূর্ব্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেবল পূর্ব্বোক্ত দুইটি সমাধির বিষয় স্থূল এখানে উহার বিষয় সূক্ষ্ম।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ—সূক্ষ্মবিষয়ের অন্ত প্রধান পর্য্যন্ত।

ব্যাখ্যা—ভূতগুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুকে স্থূল বলে। সূক্ষ্মবস্তু তন্মাত্রা হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয়, মন (অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিস্বরূপ), অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব (যাহা সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), সত্ত্ব, রজঃ ও

তমের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান, প্রকৃতি অথবা অব্যক্ত, ইহারা সমুদয়ই সূক্ষ্ম বস্তুর অন্তর্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর পড়েন না।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ—এই সকলগুলিই সবীজ সমাধি।

ব্যাখ্যা—এই সমাধিগুলিতে পূর্ব্বকর্ম্মের বীজ নাশ হয় না; সুতরাং উহাদের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। তবে উহাদের দ্বারা কি হয়? তাহা পশ্চাল্লিখিত সূত্রগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

নির্ব্বিচার-বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ—নির্ব্বিচার সমাধির স্বচ্ছতা জন্মিলে চিত্তের স্থিতির দৃঢ়তা হয় (ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা)।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ—উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে ঋতম্ভর অর্থাৎ সত্যপূর্ণ জ্ঞান বলে।

ব্যাখ্যা—পরসূত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥৪৯॥

সূত্রার্থ—যে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য ও অনুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহা সাধারণ বস্তুবিষয়ক। যে সকল বিষয় আগম ও অনুমানজন্য জ্ঞানের গোচর নহে, তাহারা পূর্ব্বকথিত সমাধির প্রকাশ্য।

ব্যাখ্যা—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা সাধারণবস্তু-

বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষানুভব, তদুপস্থাপিত অনুমান ও বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই। 'বিশ্বস্ত লোক' অর্থে যোগীরা ঋষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, ঋষি অর্থে বেদবর্ণিত ভাব-গুলির দ্রষ্টা অর্থাৎ যাঁহারা সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এই জন্য যে, উহা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য। শাস্ত্র বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও তাঁহারা বলেন, শুধু শাস্ত্র আমাদিগকে সত্য অনুভব করাইতে কখনই সমর্থ নহে। আমরা সমুদয় বেদ পাঠ করিলাম, তথাপি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হইল না। কিন্তু যখন আমরা সেই শাস্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী অনুসারে কার্য্য করি, তখনই আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত কথাগুলির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়; যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান যথায় ঘেঁসিতে পারে না, উহা তথায়ও প্রবেশে সমর্থ, তথায় আপ্তবাক্যেরও কোন কার্য্যকারিতা নাই। এই সূত্রদ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম্ম, ধর্ম্মের উহাই সার, আর অবশিষ্ট যাহা কিছু, যথা—ধর্ম্মবক্তৃতাশ্রবণ অথবা ধর্ম্মপুস্তকপাঠ বা বিচার কেবল ঐ পথের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। কেবল কোনমতে বুদ্ধির সায় দেওয়া, বা না-দেওয়া ধর্ম্ম নহে। যোগীদিগের মূল ভাব এই যে, যেমন ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধঘটনা হয়, ধর্ম্মও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে; বরং উহা আরও উজ্জ্বলতররূপে অনুভূত হইতে পারে। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি ধর্ম্মের যে সকল প্রতিপাদ্য

সত্য আছে, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা উহাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। চক্ষু দ্বারা আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না অথবা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না। আর ইহাও জানি যে, বিচার আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে না; উহা আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সমস্ত জীবন বিচার কর না কেন, তাহার ফল কি হইবে? আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করিতে পারিবে না। এইরূপ বিচার ত জগৎ সহস্রবর্ষ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে: আমরা যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি, তাহাই ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচারাদি করিয়া থাকি। অতএব ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিষয়ানুভূতিরূপ গণ্ডির ভিতর ভ্রমণ করিতে হইবেই হইবে; উহা তাহার উপর কখনই যাইতে পারে না। সুতরাং যাহা কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুভব করিতে হইবে, সমুদয়ই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে। যোগীরা বলেন, মানুষ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ও বিচারশক্তি উভয়কেই অতিক্রম করিতে পারে। মানুষের নিজ বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিবার শক্তি রহিয়াছে, আর এই শক্তি প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জন্তুতেই অন্তর্নিহিত আছে। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি জাগরিত হয়। তখন মানুষ বিচারের গণ্ডি পার হইয়া গিয়া তর্কের অগম্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করে।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ—এই সমাধিজাত (জ্ঞান ও ক্রিয়া) সংস্কার অন্যান্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য সংস্কারকে আর আসিতে দেয় না।

ব্যাখ্যা—আমরা পূর্ব্বসূত্রে দেখিয়াছি যে, এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে যাইবার একমাত্র উপায়—একাগ্রতা। আমরা আরো দেখিয়াছি, পূর্ব্বসংস্কারগুলিই কেবল আমাদিগের ঐ প্রকার একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক। তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে যখনই তোমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই তোমাদের নানাপ্রকার চিন্তা আসে। যখনই ঈশ্বরচিন্তা করিতে চেষ্টা কর, ঠিক সেই সময়েই ঐ সকল সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্য সময়ে তাহারা তত প্রবল থাকে না, কিন্তু যখনই উহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা কর, তখনই উহারা নিশ্চয় আসিবে, তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতা-অভ্যাসের সময়েই ইহারা এত প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি উহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছ বলিয়াই উহারা উহাদের সমুদয় বল প্রকাশ করে। অন্যান্য সময়ে উহারা ওরূপ ভাবে বল প্রকাশ করে না। এ সকল পূর্ব্বসংস্কারের সংখ্যাই বা কত! চিত্তের কোন স্থানে উহারা জড় হইয়া রহিয়াছে, আর ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া আক্রমণের জন্য যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ঐগুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে

রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল সেইটিই আসে, অপরাপর সমুদয় ভাবগুলি চলিয়া যায়। তাহা না হইয়া তাহারা ঐ সময়েই আসিবার চেষ্টা করিতেছে। সংস্কারসমূহের এইরূপ মনের একাগ্রতা-শক্তিকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং যে সমাধির কথা এই মাত্র বলা হইল, উহা অভ্যাস করা বিশেষ আবশ্যক; কারণ উহা ঐ সংস্কারগুলিকে নিবারণ করিতে সমর্থ। এইরূপ সমাধির অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার উত্থিত হইবে, তাহা এত প্রবল হইবে যে, অন্যান্য সংস্কারের কার্য্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিবে।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥৫১॥

সূত্রার্থ—তাহারও (অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সমুদয় সংস্কারকে অবরুদ্ধ করে) অবরোধ করিতে পারিলে, সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নির্ব্বীজ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্যাখ্যা—তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য-এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ উহা প্রকৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত অজ্ঞানী আপনার দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। তাহা অপেক্ষা একটু উন্নত লোকে মনকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত। আত্মা এই সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত

হন কেন? চিত্তে এই নানাপ্রকার তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আত্মাকে আবৃত করে, আমরা কেবল এই তরঙ্গগুলির ভিতর দিয়াই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বমাত্র দেখিতে পাই। যদি ক্রোধ-বৃত্তিরূপ প্রবাহ উত্থিত হয়, তবে আমরা আত্মাকে ক্রোধযুক্ত অবলোকন করি; বলিয়া থাকি, আমি রুষ্ট হইয়াছি। যদি প্রেমের এক তরঙ্গ চিত্তে উত্থিত হয়, তবে ঐ তরঙ্গে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া মনে করি যে, আমি ভালবাসিতেছি। যদি দুর্ব্বলতারূপবৃত্তি আসিয়া উদিত হয়, তবে উহাতে আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া মনে করি, আমি দুর্ব্বল। এই সকল বিভিন্ন পূর্ব্বসংস্কার আত্মার স্বরূপকে আবরণ করিলেই এই সকল বিভিন্ন ভাব উদিত হইয়া থাকে। চিত্তহ্রদে যতদিন পর্য্যন্ত একটিও তরঙ্গ থাকিবে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেখা যাইবে না। যতদিন না সমুদয় প্রবাহ একেবারে উপশান্ত হইয়া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই পতঞ্জলি প্রথমে এই প্রবাহস্বরূপ বৃত্তিগুলি কি, তাহা জানাইয়া দ্বিতীয়তঃ উহাদিগকে দমন করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় শিক্ষা দিলেন। তৃতীয়তঃ এই শিক্ষা দিলেন যে, যেমন এক বৃহৎ অগ্নিরাশি ক্ষুদ্র অগ্নিকণাগুলিকে গ্রাস করে, তেমনি একটি প্রবাহকে এত দূর প্রবল করিতে হইবে যাহাতে অপর প্রবাহগুলি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। যখন একটি প্রবাহমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহাকেও নিবারণ করা সহজ হইবে। আর যখন উহাও চলিয়া যাইবে, তখনই সেই সমাধিকে নির্ব্বীজ সমাধি

বলে। তখন আর কিছুই থাকিবে না, আত্মা নিজস্বরূপে নিজমহিমায় অবস্থিত হইবেন। আমরা তখনই জানিতে পারিব যে, আত্মা মিশ্র পদার্থ নহেন, উনিই জগতে একমাত্র নিত্য অমিশ্র পদার্থ, সুতরাং উঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই—উনি অমর, অবিনশ্বর, নিত্য, চৈতন্যঘন সত্তা-স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধন-পাদ

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—তপস্যা, অধ্যাত্মশাস্ত্র-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্ম্মফল-সমর্পণকে ক্রিয়াযোগ কহে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা লাভ করা অতি দুর্ঘট। এই জন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে ঐ সকল সমাধিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার প্রথম সোপানকে ক্রিয়াযোগ বলে। ইহার শব্দার্থ—কর্ম্ম-দ্বারা যোগের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যেন অশ্বস্বরূপ, মন তাহার প্রগ্রহ (রশ্মি বা লাগাম), বুদ্ধি সারথি, আত্মা সেই রথের আরোহী, আর এই শরীর রথ-স্বরূপ। গৃহস্বামিস্বরূপ মানুষের আত্মা রাজা-স্বরূপে এই রথে বসিয়া আছেন। যদি অশ্বগণ অতি প্রবল হয়, রশ্মিদ্বারা সংযত না থাকিতে চায়, আর যদি বুদ্ধিরূপ সারথি ঐ অশ্ব-গণকে কিরূপে সংযত করিতে হইবে তাহা না জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। পক্ষান্তরে, যদি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, আর মনরূপ রশ্মি বুদ্ধিরূপ সারথির হস্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, তবে ঐ রথ ঠিক উহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে। এক্ষণে এই

তপস্যা শব্দের অর্থ কি বুঝিতে পারা যাইবে। তপস্যা শব্দের অর্থ—এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালন করিবার সময় খুব দৃঢ়ভাবে রশ্মি ধরিয়া থাকা, উহাদিগকে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে না দিয়া আত্মবশে রাখা। তৎপরে, পাঠ বা স্বাধ্যায়। এ স্থলে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? নাটক, উপন্যাস বা গল্পের পুস্তক পাঠ নয়—যে সকল গ্রন্থে আত্মার মুক্তি কিসে হয় শিক্ষা দেয়, সেই সকল গ্রন্থপাঠ। আবার স্বাধ্যায় বলিতে তর্ক বা বিচারাত্মক পুস্তকপাঠ বুঝিতে হইবে না। ইহা বুঝিতে হইবে যে, যিনি যোগী, তিনি বিচারাদি করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন; আর তাঁহার বিচারে রুচি নাই। তিনি (জপ, স্তোত্র ও শাস্ত্র) পাঠ করেন, কেবল তাঁহার ধারণাগুলি দৃঢ় করিবার জন্য। দুই প্রকার শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছে, এক প্রকারের নাম বাদ (যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মক) ও দ্বিতীয়—সিদ্ধান্ত (মীমাংসাত্মক)। অজ্ঞানাবস্থায় লোকে প্রথমোক্ত প্রকার শাস্ত্রীয় জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, উহা তর্কযুদ্ধ-স্বরূপ—প্রত্যেক বস্তুর সব দিক দেখিয়া বিচার করা; এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায় উপনীত হন। কিন্তু শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিদ্ধান্ত-বিষয়ে মনের ধারণা প্রগাঢ় করিতে হইবে। শাস্ত্র অনন্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব জ্ঞানলাভের গুপ্তকৌশল এই যে, সকল বস্তুর সারভাগ গ্রহণ করা উচিত। ঐ সারটুকু লইয়া ঐ উপদেশ মত জীবনযাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই

যে, যদি তুমি কোন রাজহংসের সম্মুখে একপাত্র জলমিশ্রিত দুগ্ধ ধর, তবে সে সমুদয় দুগ্ধটুকু পান করিবে, জলটুকু ফেলিয়া রাখিবে। এইরূপে জ্ঞানের যেটুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহা গ্রহণ করিয়া অসারভাগটুকু আমাদিগকে ফেলিয়া দিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্যক করে। অন্ধভাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না। তবে যিনি যোগী, তিনি এই তর্কযুক্তির অবস্থা অতিক্রম করিয়া একটি পর্ব্বতবৎ অচল দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হয় যে, ঐ সিদ্ধান্তটিতে দৃঢ়প্রত্যয় হওয়া। তিনি বলেন, বিচার করিও না; যদি কেহ জোর করিয়া তোমার সহিত তর্ক করিতে আসে, তুমি তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। কোন তর্কের উত্তর না দিয়া শান্তভাবে তথা হইতে চলিয়া যাইবে, কারণ তর্কের দ্বারা কেবল মন চঞ্চল হয় মাত্র। তর্কের প্রয়োজন ছিল কেবল বুদ্ধিকে সতেজ করা; তাহাই যখন সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন আর উহাকে বৃথা চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধি একটি দুর্ব্বল যন্ত্র মাত্র, উহা আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের গণ্ডির মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান দিতে পারে মাত্র। যোগীর উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়াতীত প্রদেশে যাওয়া, সুতরাং তাহার পক্ষে বুদ্ধিচালনার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং তিনি আর তর্ক করেন না, চুপচাপ থাকেন। কারণ তর্ক করিতে গেলে মন সমতাচ্যুত হইয়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; আর চিত্তের এইরূপ বিশৃঙ্খলা তাঁহার

পক্ষে বিঘ্নমাত্র। এই সমুদয় তর্ক, যুক্তি বা বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বান্বেষণ কেবল প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে। এই তর্কযুক্তির অতীত প্রদেশে উচ্চতর তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে। সমুদয় জীবনটাই কেবল বিদ্যালয়ে বালকের ন্যায় বিবাদ বা বিচার-সমিতি লইয়াই পর্য্যাপ্ত নহে। ঈশ্বরে কর্ম্মফল-অর্পণ অর্থে কর্ম্মের জন্য নিজে নিজে কোনরূপ প্রশংসা বা নিন্দা না লইয়া এই দুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া নিজে শান্তিতে অবস্থিতি করা বুঝায়।

সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—ঐ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন, সমাধিকে ভাবিত বা উদ্দীপিত এবং ক্লেশজনক বিঘ্নসমুদয়কে ক্ষীণ করা।

ব্যাখ্যা—আমরা অনেকেই মনকে আদুরে ছেলের মত করিয়া ফেলিয়াছি। উহা যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকি। এই জন্য সর্ব্বদা ক্রিয়াযোগের অভ্যাস আবশ্যক, যাহাতে মনকে সংযত করিয়া নিজের বশীভূত করা যায়। এই সংযমের অভাব হইতেই যোগের সমুদয় বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ও তাহাতেই ক্লেশের উৎপত্তি। উহাদিগকে দূর করিবার উপায়—ক্রিয়াযোগের দ্বারা মনকে বশীভূত করা—উহাকে উহার কার্য্য করিতে না দেওয়া।

অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ-ক্লেশাঃ ॥ ৩॥

সূত্রার্থ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ।

ব্যাখ্যা—ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধনস্বরূপে আমাদিগকে এই সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে। অবশ্য, অবিদ্যাই ঐ অবশিষ্ট সমুদয়গুলির জননীস্বরূপা। ঐ অবিদ্যাই আমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ। আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ দুঃখে রাখে? আত্মা নিত্য আনন্দস্বরূপ, ইঁহাকে অজ্ঞান, ভ্রম, মায়া ব্যতীত আর কিসে দুঃখিত করিতে পারে? আত্মার এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভ্রমমাত্র।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং
প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—অবিদ্যাই অপরগুলির উৎপাদক ক্ষেত্রস্বরূপ। উহারা কখন লীনভাবে, কখন সূক্ষ্মভাবে, কখন অন্য বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অভিভূত হইয়া, কখন বা প্রকাশ থাকে।

ব্যাখ্যা—অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের কারণ। ঐ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। কখন কখন উহারা প্রসুপ্তভাবে থাকে। তোমরা অনেক সময় 'শিশুতুল্য নিরীহ' এই বাক্য শুনিয়া থাক, কিন্তু এই শিশুর ভিতরেই হয়ত দেবতা বা অসুরের ভাব রহিয়াছে। ঐ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। যোগীর হৃদয়ে পূর্ব্বকর্ম্মের ফলস্বরূপ ঐ সংস্কারগুলি তনুভাবে থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই, উহারা খুব সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, তিনি উহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন। তাঁহার

উহাদিগকে ব্যক্ত হইতে না দিবার শক্তি আছে। কখন কখন কতকগুলি প্রবল সংস্কার আর কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কিন্তু যখনই ঐ আচ্ছন্নকারী কারণগুলি চলিয়া যায়, তখনই আবার উহারা প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থাটিকে বিচ্ছিন্ন বলে। শেষ অবস্থাটির নাম উদার। ঐ অবস্থায় সংস্কারগুলি অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহায়তা পাইয়া শুভ বা অশুভরূপে খুব প্রবলভাবে কার্য্য করিতে থাকে।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু
নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও, আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে।

ব্যাখ্যা—এই সমুদয় সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিদ্যা। আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে, এই অবিদ্যা কি? আমরা সকলেই মনে করি, "আমি শরীর, শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নিত্য আনন্দস্বরূপ আত্মা নহি"—ইহা অবিদ্যা। আমরা মানুষকে (স্থান-বীজ-উপষ্টম্ভ-নিস্যন্দ-নিধন-দোষে দেহ স্বতঃই অশুচি) শরীর বলিয়া ভাবি এবং দেখি, ইহা মহা ভ্রম।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—দৃক্ ও দর্শনশক্তির একীভাবই অস্মিতা।

ব্যাখ্যা—আত্মাই যথার্থ দ্রষ্টা, তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র, অনন্ত ও অমর। আর দর্শনশক্তি অর্থাৎ উহার ব্যবহার্য্য যন্ত্র কি কি?

চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ, এইগুলি উহার যন্ত্র। এইগুলি তাঁহার বাহ্য জগৎ দেখিবার যন্ত্রস্বরূপ, আর আত্মার সহিত ঐগুলির একীভাবকে অস্মিতারূপ অবিদ্যা বলে। আমরা বলিয়া থাকি, "আমি চিত্তবৃত্তি, আমি রুষ্ট হইয়াছি, অথবা আমি সুখী।" কিন্তু কথা এই, কিরূপে আমরা রুষ্ট হইতে পারি বা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি? আত্মার সহিত আপনাকে অভেদ জানিতে হইবে। আত্মার ত কখন পরিণাম হয় না। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে এইক্ষণে সুখী, এইক্ষণে দুঃখী হইতে পারেন? তিনি নিরাকার, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। উহাকে পরিণামপ্রাপ্ত করাইতে পারে কে? আত্মা সর্ব্ববিধ নিয়মের অতীত। কিসে তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে? জগতের মধ্যে কিছুই আত্মার উপর কোন কার্য্য করিতে পারে না। তথাপি আমরা অজ্ঞতাবশতঃ আপনাকে মনোবৃত্তির সহিত একীভূত করিয়া ফেলি এবং সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিতেছি মনে করি।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—যে মনোবৃত্তি কেবল সুখকর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, তাহাকে রাগ বলে।

ব্যাখ্যা—আমরা কোন কোন বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি; যাহাতে আমরা সুখ পাই, মন একটি প্রবাহের মত তাহার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। সুখ-কেন্দ্রের দিকে ধাবমান আমাদের মনের ঐ প্রবাহকেই (গর্দ্ধঃ) রাগ বা আসক্তি বলে। আমরা যাহাতে

সুখ পাই না এমন কোন বিষয়েই কখন আকৃষ্ট হই না। আমরা অনেক সময়ে নানা প্রকার কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপারে সুখ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, তাহা সর্ব্বত্রই খাটে। আমরা যেখানে সুখ পাই, সেখানেই আকৃষ্ট হইয়া থাকি।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—দুঃখকর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্থিতিশীল অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষকে দ্বেষ বলে।

ব্যাখ্যা—আমরা যাহাতে দুঃখ পাই তৎক্ষণাৎ তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকি।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥৯॥

সূত্রার্থ—যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মরণানুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা।

ব্যাখ্যা—এই জীবনের মমতা প্রত্যেক জীবনেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর অনেক পরকাল সম্বন্ধীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেহেতু লোকে ঐহিক জীবন এতদূর ভালবাসে, সুতরাং 'ভবিষ্যতেও যেন জীবিত থাকি' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই। তবে ইহার মধ্যে এইটুকু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্যদেশসমূহে এই জীবনে মমতা হইতে যে পরলোকের

সম্ভাবনীয়তা সূচিত হয়, তাহা তাঁহাদের মতে কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, কিন্তু অন্যান্য জন্তুর পক্ষে নহে। ভারতে এই জীবনে মমতা, পূর্ব্বসংস্কার ও পূর্ব্বজীবন প্রমাণ করিবার একটি যুক্তিস্বরূপ হইয়াছে। মনে কর, যদি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে, আমরা যাহা কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন কল্পনাও করিতে পারি না অথবা বুঝিতেও পারি না। কুক্কুট-শাবকগণ ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যখন কুক্কুটীদ্বারা হংসডিম্ব ফুটান হইয়াছে, তখন হংসশাবক ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্র জলে চলিয়া গিয়াছে; তাহার কুক্কুটী-মাতা মনে করিল শাবকটি বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। যদি প্রত্যক্ষানুভূতিই জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে এই কুক্কুটশাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিখিল অথবা ঐ হংসশাবকগুলি জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান বলিয়া জানিতে পারিল? যদি তুমি বল, উহা সহজাত জ্ঞান (instinct) মাত্র, তবে তাহাতে কিছুই বুঝাইল না। কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ করা হইল মাত্র, কারণ ব্যাখ্যা কিছুই করা হইল না। এই সহজাত জ্ঞান কি? আমাদেরও ত এইরূপ সহজাত জ্ঞান অনেক রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাউক, আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন; আপনাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দ্দায় একটির

পর অপরটিতে কত যত্নের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু বহুবৎসরের অভ্যাসের পর এক্ষণে আপনারা হয়ত কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিবেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর অঙ্গুলি আপনা আপনি চলিতে থাকিবে। উহা এক্ষণে আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, উহা আপনাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য কার্য্য যাহা আমরা করিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধেও ঐ। অভ্যাসের দ্বারা উহা সহজাত জ্ঞানে পরিণত হয়, স্বাভাবিক হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, এক্ষণে যে ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক বা সহজাত জ্ঞানজনিত বলিয়া থাকি, সেগুলি পূর্ব্বে বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানের ক্রিয়া ছিল, এক্ষণে নিম্নভাবাপন্ন হইয়া ঐরূপ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের ভাষায় সহজাত জ্ঞান, বিচারের নিম্নভাবাপন্ন ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র। বিচারজনিত জ্ঞান অবনতভাবাপন্ন হইয়া স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হয়। অতএব, আমরা এ জগতে যাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি তাহা যে কেবলমাত্র বিচারজনিত জ্ঞানের নিম্নাবস্থা মাত্র, একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। এই বিচার আবার প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ব্বপ্রত্যক্ষানুভূতির ফল। কুক্কুটগণ শ্যেনকে ভয় করে, হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, ইহা সবই পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষানুভূতির ফলস্বরূপ। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই অনুভূতি জীবাত্মার অথবা উহা কেবল শরীরের? হংস এক্ষণে যাহা অনুভব করিতেছে, তাহা কেবল ঐ হংসের পিতৃ-পুরুষগণের অনুভূতি হইতে আসিতেছে, না উহা হংসের নিজের

প্রত্যক্ষানুভূতি? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উহা কেবল তাহার শরীরের ধর্ম্ম। কিন্তু যোগীরা বলেন, উহা মনের অনুভূতি— শরীরের ভিতর দিয়া আসিতেছে মাত্র। ইহাকেই পুনর্জ্জন্মবাদ বলে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আমাদের সমুদয় জ্ঞান যাহাদিগকে প্রত্যক্ষ, বিচারজনিত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহার সমুদয়ই প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী দিয়াই আসিতে পারে; আর যাহাকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের পূর্ব্ব প্রত্যক্ষানুভূতির ফলস্বরূপ, উহাই এক্ষণে অবনতভাবাপন্ন হইয়া সহজাত জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সমুদয় জগতের ভিতরেই এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহার উপরেই ভারতের পুনর্জ্জন্মবাদের একটি প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বানুভূত অনেক ভয়ের সংস্কার কালে এই জীবনের মমতারূপে পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই আপনা আপনি ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে কষ্টের পূর্ব্বানুভূতিজনিত সংস্কার রহিয়াছে। অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তির ভিতরে যাঁহারা জানেন যে এই শরীর চলিয়া যাইবে, যাঁহারা বলেন আত্মার মৃত্যু নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি ভয়, তাঁহাদের মধ্যেও তাঁহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণা-সত্ত্বেও আমরা এই জীবনে প্রগাঢ় মমতা দেখিতে পাই। এই জীবনে মমতা কোথা হইতে আসিল? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা আমাদের সহজ বা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের

দার্শনিক ভাষায় উহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, বলা যায়। এই সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম বা গুপ্ত হইয়া চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। এই সমুদয় পূর্ব্বমৃত্যুর অনুভূতিগুলি, যাহাদিগকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহারা যেন জ্ঞানের নিম্ন-ভূমিতে উপনীত হইয়াছে। উহারা চিত্তেই বাস করে, আর তাহারা যে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা নহে, উহারা ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিতেছে। এই চিত্তবৃত্তিগুলি অর্থাৎ যেগুলি স্থূলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি; তাহাদিগকে সহজেই দমন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সূক্ষ্মতর সংস্কারগুলির দমন কিরূপে হইবে? উহাদিগকে দমন করা যায় কিরূপে? যখন আমি রুষ্ট হই; তখন আমার সমুদয় মনটি যেন এক মহা ক্রোধের তরঙ্গাকার ধারণ করে। আমি উহা অনুভব করিতে পারি, উহাকে দেখিতে পারি, উহাকে যেন হাতে করিয়া নাড়িতে চাড়িতে পারি, উহার সহিত সহজেই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি, উহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আমি যদি মনের অতি গভীর প্রদেশে না যাইতে পারি, তবে কখনই আমি উহার মূলোৎপাটনে কৃতকার্য্য হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথা বলিল, আমারও বোধ হইতে লাগিল যে আমি গরম হইতেছি, সে আরও কড়া কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, ক্রোধবৃত্তির সহিত যেন আপনাকে মিশাইয়া ফেলিলাম। যখন সে আমাকে প্রথমে

কটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও আমার বোধ হইতেছিল যে আমার ক্রোধ আসিতেছে। তখন ক্রোধ একটি ও আমি একটি পৃথক্ পৃথক্ ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, তখন আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়া গেলাম। ঐ বৃত্তিগুলিকে মূল হইতেই—তাহাদের সূক্ষ্মাবস্থা হইতেই উৎপাটন করিতে হইবে। উহারা আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে, এটি বুঝিবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে সংযম করিতে হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহে। যে অবস্থায় ঐ বৃত্তিগুলি জ্ঞানের নিম্নভূমি হইতে একটু একটু করিয়া উদয় হয়, তাহাকেই বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা বলা যায়। যখন কোন হ্রদের তলদেশ হইতে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন আমরা উহাকে দেখিতে পাই না; শুধু তাহা নহে, উপরিভাগের খুব নিকটে আসিলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না; যখনই উহারা উপরে উঠিয়া একটি তরঙ্গাকারে পরিণত হয়, তখনই আমরা জানিতে পারি যে একটি তরঙ্গ উঠিল। যখন আমরা ঐ তরঙ্গগুলির সূক্ষ্মাবস্থাতেই উহাদিগকে ধরিতে পারিব তখনই আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। এইরূপে যত দিন না আমরা স্থূলভাবে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই সূক্ষ্মাবস্থায় ঐ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করিতে পারিব, ততদিন কোন বৃত্তিই পূর্ণরূপে সংযম করিতে পারিব না। ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলিকে সংযম করিতে হইলে, আমাদিগকে উহাদের মূলে গিয়া সংযম করিতে হইবে। তখনই, কেবল তখনই আমরা

উহাদের বীজপর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব; যেমন ভর্জ্জিত বীজ মৃত্তিকায় ছড়াইয়া দিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ এই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি আর উদয় হইবে না।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—সেই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোমপরিণাম দ্বারা নাশ করিতে হয়।

ব্যাখ্যা—ধ্যানের দ্বারা যখন চিত্তবৃত্তিগুলি নষ্ট হয়, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে সূক্ষ্মসংস্কার বা বাসনা বলে। উহাকে নাশ করিবার উপায় কি? উহাকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। প্রতিলোম-পরিণাম অর্থে কার্য্যের কারণে লয়। চিত্তরূপ কার্য্য যখন সমাধিদ্বারা অস্মিতারূপ স্বকারণে লীন হইবে, তখনই চিত্তের সহিত ঐ সংস্কারগুলিও নষ্ট হইয়া যাইবে।

ধ্যানহেয়াস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্থূলাবস্থা নাশ করিতে হয়।

ব্যাখ্যা—ধ্যানেই এই বৃহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ করিবার এক প্রধান উপায়। ধ্যানের দ্বারা মনের বৃত্তিরূপ তরঙ্গসকল লয় পাইবে। যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ধ্যান অভ্যাস কর, (যতদিন না উহা তোমার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়, যতদিন

না তুমি ইচ্ছা না করিলেও ঐ ধ্যান আপনা হইতেই আসে)—তাহা হইলে ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি চলিয়া যাইবে।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—কর্ম্মের আশয়ের মূল এই পূর্ব্বোক্ত ক্লেশগুলি ; বর্ত্তমান অথবা পরজীবনে উহারা ফল প্রসব করে।

ব্যাখ্যা—কর্ম্মাশয়ের অর্থ এই সংস্কারগুলির সমষ্টি। আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, অমনি মনোহ্রদে একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়। আমরা মনে করি, ঐ কার্য্যটি শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটিও চলিয়া যাইবে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা যেন সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তথাপি তখনও ঐ স্থানেই রহিয়াছে। যখন আমরা উহা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহা পুনর্ব্বার উদিত হইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। সুতরাং জানা যাইতেছে, উহা মনের ভিতর গূঢ়ভাবে ছিল ; যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি অসম্ভব হইত। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করে ও ঐ স্থানেই সঞ্চিত থাকে। সুখকর অথবা দুঃখকর সকল প্রকার চিন্তাকেই ক্লেশ বলে, কারণ যোগীদের মতে উভয়ই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে যে সকল সুখ পাওয়া যায়, তাহারা পরিণামে দুঃখ আনয়ন করিবেই করিবে। ভোগে ভোগতৃষ্ণা বাড়িয়া থাকে ;

তাহার ফল দুঃখ। মানুষের বাসনার অন্ত নাই, মানুষ ক্রমাগত বাসনা করিতেছে; বাসনা করিতে করিতে যখন সে এমন স্থানে উপনীত হয় যে কোন মতে তাহার বাসনা আর পরিপূর্ণ হয় না, তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই যোগীরা শুভ অশুভ সমুদয় সংস্কারগুলির সমষ্টিকে ক্লেশ বলিয়া থাকে, উহারা আত্মার মুক্তির পথে বাধা প্রদান করে। সমুদয় কার্য্যের সূক্ষ্মমূলস্বরূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে যে তাহারা কারণস্বরূপ হইয়া ইহজীবনে অথবা পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া থাকে (দৃষ্ট বা অদৃষ্ট জন্ম-বেদনীয়)। বিশেষ বিশেষ স্থলে ঐ সংস্কারগুলির প্রাবল্যহেতু উহারা অতি শীঘ্রই ফল প্রসব করে, অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্য বা পাপকর্ম্ম ইহজীবনেই তাহার ফল উৎপাদন করে। যোগীরা বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি ইহজীবনেই খুব প্রবল শুভসংস্কার উপার্জ্জন করিতে পারেন তাঁহাদের মৃত্যু হয় না, তাঁহারা ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন। যোগীদিগের গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। ইঁহারা আপনাদের শরীরের উপাদান পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলেন। ইঁহারা নিজেদের দেহের পরমাণুগুলিকে এমন নূতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তাঁহাদের আর কোন পীড়া হয় না এবং আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও তাঁহাদের নিকট আসিতে পারে না। এরূপ ঘটনা না হইবার কোন কারণ নাই। শারীরবিধান-শাস্ত্র খাদ্যের অর্থ করেন—সূর্য্য হইতে শক্তিগ্রহণ। ঐ শক্তি প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদকে আবার কোন পশু

ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, আমরা সূর্য্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইলাম। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ করিবার যে একমাত্র উপায় থাকিবে, তাহা কে বলিল? আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তি-সংগ্রহের উপায় ঠিক তাহা নহে; আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, পৃথিবী সেরূপে করে না, কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই কোন না কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। যোগীরা বলেন, তাঁহারা কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন, আমরা সাধারণ উপায় অবলম্বন না করিয়াও যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। ঊর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু বিস্তার করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে সেই তন্তু অবলম্বন না করিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আমাদের উপাদানীভূত পদার্থ হইতে এই স্নায়ুজাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই স্নায়ুপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে বদ্ধ থাকিবার আমার প্রয়োজন কি? এই তত্ত্বটি আর একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে তড়িৎশক্তিকে প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু উহা প্রেরণ করিবার জন্য আমাদের তারের আবশ্যক হয়। কেন, প্রকৃতি ত বিনা তারে বহু পরিমাণে শক্তি প্রেরণ করিতেছেন।

আমরাই বা কেন তাহা করিতে পারি না? আমরা চতুর্দ্দিকে মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা যাহাকে মন বলি, তাহা প্রায় তড়িৎশক্তির সদৃশ। স্নায়ুর মধ্যে যে এক তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যে অনেক পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ তড়িতের ন্যায় উহারও প্রান্তদ্বয়ে বিপরীত শক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় এবং তড়িতের অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম, উহাতেও সেই ধর্ম্মগুলি দেখা যায়। এই তড়িৎশক্তিকে এক্ষণে আমরা কেবল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য না লইয়াই বা আমরা কেন ইহা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইব না? যোগী বলেন, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব; শুধু সম্ভব নহে, ইহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। আর ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে তুমি সমুদয় জগতের মধ্যেই আপনার এই শক্তি পরিচালন করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্য না লইয়াই যেখানে ইচ্ছা, যে শরীরের উপর ইচ্ছা কার্য্য করিতে পারিবে। যখন কোন আত্মা এই স্নায়ুযন্ত্ররূপ প্রণালীর ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, আমরা তখন তাঁহাকে জীবিত, আর এই যন্ত্রগুলির নাশ হইলেই তাঁহাকে মৃত বলি। কিন্তু যিনি এইরূপে স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যেই হউক অথবা তৎসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়াই হউক, উভয় প্রকারেই কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু এই দুই শব্দের কোন অর্থই নাই। জগতে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর আছে, সবই তন্মাত্রাদ্বারা রচিত, কেবল প্রভেদ

তাহাদের বিন্যাসের প্রণালীতে। যদি তুমিই ঐ বিন্যাসের কর্ত্তা হও, তাহা হইলে তুমি যেরূপে ইচ্ছা, ঐ তন্মাত্রাগুলির বিন্যাস করিয়া শরীর রচনা করিতে পার। এই শরীর তুমি ছাড়া আর কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? আহার করে কে? যদি আর একজন তোমার হইয়া আহার করিয়া দিত, তোমাকে বড় বেশী দিন বাঁচিতে হইত না। ঐ খাদ্য হইতে রক্তই বা উৎপাদন করে কে? নিশ্চয় তুমিই। ঐ রক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? তুমিই। আমরাই দেহের কর্ত্তা এবং উহাতে বাস করিতেছি। কেবল উহা কিরূপে নূতন করিয়া গড়িতে হয়, সেই জ্ঞান আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা যন্ত্র-তুল্য অবনতস্বভাব হইয়া পড়িয়াছি। আমরা দেহের পরমাণুগুলির বিন্যাসপ্রণালী ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং আমরা এক্ষণে যাহা যন্ত্রবৎ করিতেছি, তাহা জ্ঞাতসারে করিতে হইবে। আমরাই কর্ত্তা, সুতরাং আমাদিগকেই এই বিন্যাসপ্রণালীকে নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই আমরা ইচ্ছামত নূতন করিয়া দেহের নির্ম্মাণে সমর্থ হইব; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু কিছুই থাকিবে না।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার ফলস্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয়।

ব্যাখ্যা—মূল অর্থাৎ সংস্কাররূপী কারণগুলি ভিতরে থাকাতে তাহারাই ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের নাশ হইয়া কার্য্যের উদয় হয়, আবার কার্য্য সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণস্বরূপ হয়। বৃক্ষ বীজ প্রসব করে; বীজ আবার পরবর্ত্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। এই-রূপেই কার্য্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। আমরা এক্ষণে যে কিছু কর্ম্ম করিতেছি, সমুদয়ই পূর্ব্বসংস্কারের ফলস্বরূপ। এই কার্য্যগুলি আবার সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণ হইবে; এইরূপেই কার্য্যকারণ-প্রবাহ চলিতে থাকে। এই সূত্র এই জন্যই বলিতেছে যে, কারণ থাকিলে তাহার ফল বা কার্য্য অবশ্যই হইবে। এই ফল প্রথমতঃ জাতিরূপে প্রকাশ পায়; কেহ বা মানুষ হইবেন, কেহ দেবতা, কেহ পশু, কেহ বা অসুর হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, এই কর্ম্ম আবার আয়ুকেও নিয়মিত করিবে। একজন হয়ত পঞ্চাশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অপরের জীবন হয়ত শত বর্ষ, আবার কেহ হয়ত দুই বৎসর জীবিত থাকিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে আর মোটেই পূর্ণবয়স্ক হয় না। এই যে বিভিন্নতা, ইহা কেবল পূর্ব্বকর্ম্মদ্বারা নিয়মিত হয়। কাহাকেও দেখিলে বোধ হয় যে, কেবল সুখভোগের জন্যই তাহার জন্ম; যদি সে বনে গিয়া লুকাইয়া থাকে, সুখ যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। আর একজন যেখানেই যায়, দুঃখ যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সবই তাহার নিকট দুঃখময় হইয়া দাঁড়ায়। এই সমুদয়ই তাহাদের নিজ নিজ পূর্ব্বকর্ম্মের ফল। যোগীদিগের

মতে, সমুদয় পুণ্যকর্ম্মে সুখ ও সমুদয় পাপকর্ম্মে দুঃখ আনয়ন করে। যে ব্যক্তি কোন অসৎ কার্য্য করে, সে নিশ্চয়ই ক্লেশরূপে তাহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়া উহাদের ফল আনন্দ ও দুঃখ।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—কি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে ভোগব্যাঘাতের আশঙ্কায়, অথবা সুখের সংস্কারজনিত তৃষ্ণার প্রসবকারী বলিয়া, আর গুণবৃত্তি, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর নিকট সবই দুঃখ বলিয়া বোধ হয়।

ব্যাখ্যা—যোগীরা বলেন, যাঁহার বিবেকশক্তি আছে, যাঁহার একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি সুখ ও দুঃখ নামধেয় সর্ব্ববিধ বস্তুর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকেন, আর জানিতে পারেন যে, উহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে রহিয়াছে। একটির সঙ্গে আর একটি যেন জড়াইয়া, একটি যেন আর একটিতে মিশিয়া আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মানুষ সমুদয় জীবন কেবল এক আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে; সে কখনই তাহার বাসনা পূরণে সমর্থ হয় না। এক সময়ে মহারাজ

যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, "জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা ভূতগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিতেছি, তথাপি আমরা মনে করিতেছি আমরা কখনই মরিব না।" চতুর্দ্দিকে মূর্খ ব্যক্তিগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে করিতেছি, কেবলমাত্র আমরাই পণ্ডিত—আমরাই কেবল মূর্খশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। চতুর্দ্দিকে সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলতার দৃষ্টান্ত বেষ্টিত হইয়া আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাসাই একমাত্র স্থায়ী ভালবাসা। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? ভালবাসাও স্বার্থপরতামিশ্রিত। যোগী বলেন, 'পরিণামে দেখিতে পাইব, এমন কি, পতিপত্নীর প্রেম, সন্তানের প্রতি ভালবাসা এবং বন্ধুগণের প্রণয় পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে ক্ষয় হইয়া নাশ পায়।' এই সংসারে ক্ষয় প্রত্যেক বস্তুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। যখনই—কেবল যখনই সংসারের সকল বাসনা, এমন কি ভালবাসা পর্য্যন্ত বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের ন্যায় মানুষ বুঝিতে পারে এই জগৎ কি ভ্রম, যেন স্বপ্নসদৃশ! তখনই এক বিন্দু বৈরাগ্যভাব তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে, তখনই সে জগতের অতীত সত্তার যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই পারলৌকিক তত্ত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়; এই জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে, ইহা কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না। এমন কোন মহাত্মা হন নাই, যাঁহাকে এই উচ্চাবস্থা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সুখভোগ ত্যাগ করিতে হয় নাই। দুঃখের কারণ, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিগুলির পরস্পর বিরোধ। মানুষকে একটি একদিকে, অপরটি আর

একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—যে দুঃখ এখনও আসে নাই, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—কর্ম্মের কিঞ্চিদংশ আমাদের ভোগ হইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিদংশ আমরা বর্ত্তমানে ভোগ করিতেছি, আর অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে। আমাদের যাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে, তাহা ত চুকিয়া গিয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে যাহা ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে, কেবল যে কর্ম্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে, তাহাই আমরা জয় অর্থাৎ নাশ করিতে পারিব। এই কারণেই আমাদিগের সমুদয় শক্তি, যে কর্ম্ম এক্ষণেও কোন ফল প্রসব করে নাই, তাহারই নাশের জন্য নিযুক্ত করা আবশ্যক।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—এই যে হেয়, অর্থাৎ যে দুঃখকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ।

ব্যাখ্যা—এই দ্রষ্টার অর্থ কি? মনুষ্যের আত্মা—পুরুষ। দৃশ্য কি? মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমুদয় প্রকৃতি। এই পুরুষ ও মনের সংযোগ হইতেই সুখদুঃখ সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। তোমাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, এই যোগশাস্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধস্বরূপ; যখনই উহা প্রকৃতির

সহিত সংযুক্ত হয় ও প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই উহা হয় সুখ, নয় দুঃখ অনুভব করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—দৃশ্য অর্থে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। উহা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল। উহা দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য।

ব্যাখ্যা—দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি, ভূত ও ইন্দ্রিয়সমষ্টিরূপ; ভূত বলিতে স্থূল, সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্দ্রিয় অর্থে চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহাদের ধর্ম্ম আবার তিন প্রকার; যথা—প্রকাশ, কার্য্য ও স্থিতি অর্থাৎ জড়ত্ব; ইহাদিগকেই অন্য কথায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বলে। সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই, যাহাতে পুরুষ সমুদয় ভোগ করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার মহান্ ঐশ্বরিক ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। এ বিষয়ে একটি বড় সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। অসুর বধের নিমিত্ত কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শূকর হইয়া কর্দ্দমের ভিতর বাস করিতেন, তাঁহার অবশ্য একটি শূকরী ছিল, সেই শূকরী হইতে তাঁহার অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। অসুর বধ হওয়ার পর তিনি অতি সুখে কালযাপন করিতেন। কতকগুলি দেবতা তাঁহার দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ‘আপনি দেবরাজ, সমুদয় দেবগণ আপনার শাসনে অবস্থিত,

আপনি এখানে কেন?' কিন্তু ইন্দ্র উত্তর দিলেন, 'আমি বেশ আছি, আমি স্বর্গ চাই না; এই শূকরী ও শাবকগুলি যতদিন আছে, ততদিন স্বর্গাদি কিছুই প্রার্থনা করি না।' তখন সেই দেবগণ কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে তাঁহারা মনে মনে এক সংকল্প স্থির করিলেন এবং ধীরে ধীরে আসিয়া একটি শাবককে মারিয়া ফেলিলেন। এইরূপে একটি একটি করিয়া সমুদয় শাবকগুলি হত হইল। দেবগণ অবশেষে সেই শূকরীকেও মারিয়া ফেলিলেন। যখন ইন্দ্রের পরিবারবর্গ সকলেই মৃত হইল, তখন ইন্দ্র কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দেবতারা ইন্দ্রের নিজের শূকরদেহটিকে পর্য্যন্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র সেই শূকরদেহ হইতে নির্গত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমি দেবরাজ, আমি এই শূকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম বলিয়া মনে করিতেছিলাম; শুধু তাহাই নহে, সমুদয় জগৎই শূকরদেহ ধারণ করুক, আমি এই ইচ্ছা করিতেছিলাম।' পুরুষও এইরূপে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, তিনি যে শুদ্ধস্বভাব ও অনন্তস্বরূপ তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। পুরুষকে অস্তিত্বশালী বলিতে পারা যায় না, কারণ পুরুষ স্বয়ং অস্তিত্বস্বরূপ। আত্মাকে জ্ঞানসম্পন্ন করিতে পারা যায় না, কারণ আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাকে প্রেমসম্পন্ন বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপ। আত্মাকে অস্তিত্বশালী, জ্ঞানযুক্ত

অথবা প্রেমময় বলা সম্পূর্ণ ভুল। প্রেম, জ্ঞান ও অস্তিত্ব পুরুষের গুণ নহে, উহারা ঐ পুরুষের স্বরূপ। যখন উহারা কোন বস্তুর উপর প্রতিবিম্বিত হয়, তখন উহাদিগকে সেই বস্তুর গুণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু উহারা পুরুষের গুণ নহে, উহারা সেই মহান্ আত্মার—অনন্ত পুরুষের স্বরূপ—ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তিনি এতদূর স্বরূপবিভ্রষ্ট হইয়াছেন যে, যদি তুমি তাঁহার নিকট গিয়া বল, 'তুমি শূকর নহ,' তিনি চীৎকার করিতে থাকিবেন ও তোমাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিবেন। মায়ার মধ্যে, এই স্বপ্নময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। এখানে কেবল রোদন, কেবল দুঃখ, কেবল হাহাকার—এখানকার ব্যাপারই এই যে কয়েকটি সুবর্ণগোলক 'যেন গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ উহা পাইবার জন্য পরস্পর প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতেছে। তুমি কোন নিয়মেই কখন বদ্ধ ছিলে না। প্রকৃতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই। যোগী তোমাকে ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন, সহিষ্ণুতার সহিত ইহা শিক্ষা কর। যোগী তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, কিরূপে এই প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া, আপনাকে মন ও জগতের সহিত মিশাইয়া পুরুষ আপনাকে দুঃখী ভাবিতেছে। যোগী আরও বলেন, এই দুঃখময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে তাহার উপায় এই যে, প্রাকৃতিক সমুদয় সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইবে। ভোগ করিতে হইবে নিশ্চয়ই, তবে ভোগ যত শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। আমরা

আপনাদিগকে এই জালে ফেলিয়াছি, আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। আমরা নিজেরা এই ফাঁদে পা দিয়াছি, আমাদিগকে নিজ চেষ্টায়ই উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। অতএব এই পতিপত্নীসম্বন্ধীয়, মিত্রসম্বন্ধীয় ও অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের আকাঙ্ক্ষা আছে, সবই ভোগ করিয়া লও। যদি নিজের স্বরূপ সর্ব্বদা স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্রই নির্ব্বিঘ্নে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। এই অবস্থা যে অতি অল্পক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়া বাধ্য হইয়া যাইতে হইতেছে, একথা কখনও ভুলিও না। ভোগ—এই সুখ-দুঃখের অনুভবই—আমাদের একমাত্র মহান্ শিক্ষক, কিন্তু ঐ ভোগগুলিকে কেবল সাময়িক পথের ব্যাপার বলিয়া যেন মনে থাকে; উহারা ক্রমশঃ আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় বস্তু অতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবেন; তখন সমুদয় জগৎ যেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, তখন উহা আপনা আপনিই চলিয়া যাইবে, কারণ উহা শূন্যস্বরূপ। সুখদুঃখভোগ আমাদিগকে করিতেই হইবে, কিন্তু আমরা যেন আমাদের চরম লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত না হই।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—গুণের এই পশ্চাল্লিখিত অবস্থা কয়েকটি আছে, যথা—বিশেষ (ভূতেন্দ্রিয়), অবিশেষ (তন্মাত্র অস্মিতা), কেবল চিহ্নমাত্র (মহৎ) ও চিহ্ন-শূন্য (প্রকৃতি)।

ব্যাখ্যা—আমি আপনাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, যোগশাস্ত্র সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত; এখানেও পুনর্ব্বার সাংখ্যদর্শনের জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এই উভয়ই। এই প্রকৃতি আবার ত্রিবিধ ধাতুতে নির্ম্মিত, যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমঃ পদার্থটি কেবল অন্ধকারস্বরূপ, যাহা কিছু অজ্ঞানাত্মক ও গুরু পদার্থ সবই তমোময়। রজঃ ক্রিয়াশক্তি। সত্ত্ব স্থির প্রকাশস্বভাব। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকেন, তাহাকে সাংখ্যে অব্যক্ত, অবিশেষ বা অবিভক্ত বলে; ইহার অর্থ এই, যে অবস্থায় নামরূপের কোন প্রভেদ নাই, যে অবস্থায় ঐ তিনটি পদার্থ ঠিক সাম্যভাবে থাকে। তৎপরে যখন এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া বৈষম্যাবস্থা আসে, তখন এই তিন পদার্থ পৃথক পৃথক ভাবে পরস্পর মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই তিন পদার্থ বিরাজমান। যখন সত্ত্ব প্রবল হয় তখন জ্ঞানের উদয় হয়, রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, আলস্য ও অজ্ঞান আসে। সাংখ্যমতানুসারে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ মহৎ অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব—উহাকে সর্ব্বব্যাপী বা সার্ব্বজনীন বুদ্ধিতত্ত্ব বলা যায়। প্রত্যেক মনুষ্যবুদ্ধিই এই সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের একটি অংশমাত্র। সাংখ্যমনোবিজ্ঞান-মতে মন ও বুদ্ধির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। মনের কার্য্য কেবল বিষয়াভিঘাতজনিত, বেদনাগুলিকে লইয়া ভিতরে জড়

করা ও বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত মহতের নিকট প্রদান করা। বুদ্ধি ঐ সকল বিষয় নিশ্চয় করে। মহৎ হইতে অহংতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব হইতে সূক্ষ্ম-ভূতের উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্ম-ভূতসকল আবার পরস্পর মিলিত হইয়া এই বাহ্য স্থূল-ভূতরূপে পরিণত হয়; তাহা হইতেই এই স্থূল জগতের উৎপত্তি; সাংখ্যদর্শনের মত—বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া একখণ্ড প্রস্তর পর্য্যন্ত সমুদয়ই এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা লইয়াই উহাদের প্রভেদ। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য্য। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় প্রকৃতির বাহিরে, তিনি জড় নহেন। বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রা অথবা স্থূল-ভূত, পুরুষ কাহারই সদৃশ নহেন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক্, ইঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। ইহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্য মৃত্যুরহিত অজর অমর, কারণ উনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নন। যাহা মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখন নাশ হইতে পারে না। এই পুরুষ বা আত্মাসমূহের সংখ্যা অগণন।

এক্ষণে আমরা এই সূত্রটির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব। বিশেষ অর্থে স্থূল ভূতগণকে লক্ষ্য করিতেছে—যেগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। অবিশেষ অর্থে সূক্ষ্মভূত—তন্মাত্রা, এই তন্মাত্রা সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু পতঞ্জলি বলেন, 'যদি তুমি যোগাভ্যাস কর, কিছুদিন পরে তোমার অনুভবশক্তি এতদূর সূক্ষ্ম হইবে যে, তুমি তন্মাত্রাগুলিকে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে।' তোমরা

শুনিয়াছ প্রত্যেক ব্যক্তির এক প্রকার জ্যোতিঃ আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্ব্বদা এক প্রকার আলোক বাহির হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, 'কেবল যোগীই উহা দেখিতে সমর্থ। আমরা সকলে উহা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যেমন পুষ্প হইতে সর্ব্বদাই পুষ্পের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণুস্বরূপ তন্মাত্রা নির্গত হয়, যদ্দারা আমরা আঘ্রাণ করিতে পারি, সেইরূপ আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদাই এই তন্মাত্রা সকলও বাহির হইতেছে। প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে শুভ বা অশুভ কোন না কোন প্রকারের রাশীকৃত শক্তি বাহির হইতেছে। সুতরাং আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই আকাশ এই তন্মাত্রায় পূর্ণ থাকে। মানুষ ইহার প্রকৃত রহস্য না জানিলেও ইহা হইতেই অজ্ঞাতসারে মানুষের অন্তরে মন্দির, গির্জ্জাদি করিবার ভাব আসিয়াছে। ভগবানকে উপাসনা করিবার জন্য মন্দিরনির্ম্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? কেন, যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ত চলিত। ইহার কারণ এই, মানুষ নিজে এই রহস্যটি না জানিলেও তাহার মনে স্বভাবতঃ এইরূপ উদয় হইয়াছিল যে, যেখানে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। লোকে প্রত্যহই তথায় গিয়া থাকে; লোকে তথায় যতই যাতায়াত করে, ততই তাহারা পবিত্র হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটিও পবিত্রতর হইতে থাকে। যে ব্যক্তির অন্তরে ততদূর সত্ত্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে গমন করে, তাহারও সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইবে। অতএব মন্দিরাদি

ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এটি সর্ব্বদাই স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, সাধু লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। কিন্তু লোকের এই গোল হইয়া পড়ে যে, লোকে উহার মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যায়—হইয়া শকটকে অশ্বের অগ্রে যোজনা করিতে ইচ্ছা করে। প্রথমে লোকেই সেই স্থানকে পবিত্র করিয়াছিল, তৎপরে সেই স্থানের পবিত্রতারূপ কার্য্যটি আবার কারণ হইয়া লোককেও পবিত্র করিত। যদি সে স্থানে সর্ব্বদা অসাধু লোক যাতায়াত করে, তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য স্থানের ন্যায়ই অপবিত্র হইয়া যাইবে। বাটীর গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু এইটিই আমরা সর্ব্বদা ভুলিয়া যাই। এই কারণেই প্রবলসত্ত্বগুণসম্পন্ন সাধু ও মহাত্মাগণ চতুর্দ্দিকে ঐ সত্ত্বগুণ বিকিরণ করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের উপর মহাপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মানুষ এতদূর পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন একেবারে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে—দেহ ফুটিয়া বাহির হইবে। সাধুর শরীর পবিত্র হইয়া যায়, সুতরাং সেই দেহ যেথায় বিচরণ করে তথায় পবিত্রতা বিকিরণ করিয়া থাকে। ইহা কবিত্বের ভাষা নয়, রূপক নয়, বাস্তবিক সেই পবিত্রতা যেন ইন্দ্রিয়গোচর একটি বাহ্য বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার একটা যথার্থ অস্তিত্ব—যথার্থ সত্তা আছে। যে ব্যক্তি সেই লোকের সংস্পর্শে আসে, সে-ই পবিত্র হইয়া যায়।

এক্ষণে 'লিঙ্গমাত্রের' অর্থ কি, দেখা যাউক। লিঙ্গমাত্র

বলিতে বুদ্ধিকে বুঝায়; উহা প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহা হইতেই অন্যান্য সমুদয় বস্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে। গুণের শেষ অবস্থাটির নাম অলিঙ্গ বা চিহ্নশূন্য। এই স্থানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও সমুদয় ধর্ম্মে এক মহা বিবাদ দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মেই এই এক সাধারণ সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জগৎ চৈতন্যশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষ কি-না, এ বিচার ছাড়িয়া দিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ধরিলে ঈশ্বরবাদের তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্যই সৃষ্টির আদি বস্তু; তাহা হইতেই স্থূল ভূতের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, চৈতন্যই সৃষ্টির শেষ বস্তু। অর্থাৎ তাঁহাদের মত এই যে, অচেতন জড় বস্তু সকল অল্পে অল্পে জীবরূপে পরিণত হইয়াছে, এই জীবগণ আবার ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মনুষ্যাকার ধারণ করে। তাঁহারা বলেন, জগতের সমুদয় বস্তু যে চৈতন্য হইতে প্রসূত হইয়াছে তাহা নহে, বরং চৈতন্যই সৃষ্টির সর্ব্বশেষ বস্তু। যদিও এইরূপে ধর্ম্মসমূহের ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলেও এই দুইটি সিদ্ধান্তকেই সত্য বলিতে পারা যায়। একটি অনন্ত শৃঙ্খল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-খ ইত্যাদি; এক্ষণে প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে ক আদিতে অথবা খ আদিতে? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক-খ এইরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে অবশ্য 'ক'কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু তুমি উহাকে খ-ক এই ভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে 'খ'কেই আদি ধরিতে হইবে। আমরা যে দৃষ্টিতে উহাকে দেখিব, উহা সেই

ভাবেই প্রতীয়মান হইবে। চৈতন্য অনুলোম-পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্থূলভূতের আকার ধারণ করে, স্থূলভূত আবার বিলোম-পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যরূপে পরিণত হয়। সাংখ্য ও সমুদয় ধর্ম্মাচার্য্যগণই চৈতন্যকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে ঐ শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, যথা--প্রথমে চৈতন্য, পরে ভূত। বৈজ্ঞানিক প্রথমে ভূতকে গ্রহণ করিয়া বলেন, প্রথমে ভূত পরে চৈতন্য। কিন্তু এই উভয়েই সেই একই শৃঙ্খলের কথা কহিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই চৈতন্য ও ভূত উভয়েরই উপর গিয়া পুরুষ বা আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্মা জ্ঞানেরও অতীত; জ্ঞান যেন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত আলোকস্বরূপ।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—দ্রষ্টা কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি স্বয়ং পবিত্রস্বরূপ, তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি দেখিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—এখানেও সাংখ্যদর্শনের কথা বলা হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের এই মত যে, অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু পুরুষগণই এই প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুষগণের কোন গুণ নাই। তবে আত্মা দুঃখী বা সুখী বলিয়া প্রতীয়মান হন কেন? কেবল বুদ্ধির উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া তিনি ঐ সকল রূপে প্রতীয়মান হন। যেমন এক খণ্ড স্ফটিকের নিকট একটি লাল ফুল রাখিলে ঐ

স্ফটিকটিকে লাল দেখাইবে; সেইরূপ আমরা যে সুখ বা দুঃখ বোধ করিতেছি, তাহা বাস্তবিক প্রতিবিম্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে এ সকল কিছুই নাই। আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রকৃতি এক বস্তু, আত্মা এক বস্তু, সম্পূর্ণ পৃথক, সর্ব্বদা পৃথক। *সাংখ্যেরা বলেন যে, জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ,* উহার হ্রাস বৃদ্ধি উভয়ই আছে, উহা পরিবর্ত্তনশীল; শরীরের ন্যায় উহাও ক্রমশঃ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, শরীরের যে সকল ধর্ম্ম, উহাতেও প্রায় তৎসদৃশ ধর্ম্ম বিদ্যমান। শরীরের পক্ষে নখ যদ্রূপ, জ্ঞানের পক্ষে দেহও তদ্রূপ। নখ শরীরের একটি অংশবিশেষ, উহাকে শত শত বার কাটিয়া ফেলিলেও শরীর থাকিয়া যাইবে। এইরূপ এই শরীর শত শত বার নষ্ট হইলেও জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই ' জ্ঞান কখনও অবিনাশী হইতে পারে না, কারণ উহা পরিবর্ত্তনশীল, উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে; আর যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহা কখনও অবিনাশী হইতে পারে না। এই জ্ঞান অবশ্যই জন্যপদার্থ। আর 'ইহা জন্য' এই কথাতেই বুঝাইতেছে, ইহার উপরে—ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য এক পদার্থ আছে; কারণ জন্যপদার্থ কখনও মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। ভূতসংশ্লিষ্ট সমুদয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং তাহা চিরকালের জন্য বদ্ধভাবাপন্ন। তবে প্রকৃত মুক্ত কে? যিনি কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, তিনিই প্রকৃত মুক্তস্বভাব। যদি তুমি বল, মুক্তভাবটি ভ্রমাত্মক, আমি বলিব এই বন্ধনভাবটিও ভ্রমাত্মক। আমাদের জ্ঞানে এই দুই ভাবই সদা বিরাজিত; ঐ ভাবদ্বয় পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত;

একটি না থাকিলে অপরটি থাকিতে পারে না। উহাদের মধ্যে একটির ভাব এই যে, আমরা বদ্ধ। মনে কর, আমাদের ইচ্ছা হইল আমরা দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইব। আমাদের মাথা দেওয়ালে লাগিয়া গেল, তাহা হইলে বুঝিলাম আমরা ঐ দেওয়ালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাইতেছি আমাদের ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, আমাদের মনে হয় এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা যেথানে ইচ্ছা পরিচালিত করিতে পারি। প্রতিপদে আমরা দেখিতেছি, এই বিরোধী ভাবদ্বয় আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আমরা মুক্ত, ইহা আমাদিগকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে; কিন্তু আবার প্রতি মুহূর্ত্তেই দেখিতেছি যে, আমরা মুক্ত নহি। যদি দুইটির ভিতরে একটি ভাব ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটিও ভ্রমাত্মক হইবে; আর যদি একটি সত্য হয়, তবে অপরটিও সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অনুভবরূপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। যোগী বলেন, এই দুই ভাবের উভয়টিই সত্য। বুদ্ধি পর্য্যন্ত ধরিলে আমরা বাস্তবিক বদ্ধ। কিন্তু আত্মা হিসাবে আমরা মুক্তস্বভাব। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা বা পুরুষ—কার্য্যকারণশৃঙ্খলের বাহিরে। এই আত্মারই মুক্ত-স্বভাবটি ভূতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারই জ্যোতিঃ সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। বুদ্ধির নিজের কোন চৈতন্য নাই। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই মস্তিষ্কে এক একটি কেন্দ্র আছে। সমুদয় ইন্দ্রিয়ের যে একমাত্র কেন্দ্র

তাহা নহে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কেন্দ্র পৃথক পৃথক। তবে আমাদের এই অনুভূতিগুলি কোথায় যাইয়া একত্ব লাভ করে? যদি মস্তিষ্কে তাহারা একত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা সকলগুলির একটি মাত্র কেন্দ্র থাকিত। কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া জানি যে, প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে। কিন্তু লোকে এক সময়েই দেখিতে শুনিতে পায়। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে অবশ্যই এক একত্ব আছে। বুদ্ধি নিত্যকালই মস্তিষ্কের সহিত সম্বদ্ধ—কিন্তু এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। তিনি একত্বস্বরূপ। তাঁহার নিকট গিয়াই এই সমুদয় অনুভূতিগুলি একীভাব ধারণ করে। আত্মাই সেই কেন্দ্র, যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি একীভূত হয়। আর আত্মা মুক্তস্বভাব। এই আত্মারই মুক্ত স্বভাব তোমাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই বলিতেছে যে তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি ভ্রমে পড়িয়া সেই মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহূর্ত্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছ। তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, বুদ্ধি মুক্তস্বভাব নহে। তুমি আবার সেই মুক্ত স্বভাব দেহে আরোপ করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেন যে, তুমি ভুলিয়াছ; মুক্তি দেহের ধর্ম্ম নহে। এই জন্যই একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধন এই দুই প্রকারের অনুভূতিই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী মুক্তি ও বন্ধন, উভয়েরই বিচার করেন; আর তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার

চলিয়া যায়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্তস্বভাব, জ্ঞানঘন, তিনিই বুদ্ধিরূপ উপাধির মধ্য দিয়া এই সান্ত জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই হিসাবেই তিনি বদ্ধ।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতির আত্মা (স্বরূপ অর্থাৎ বিভিন্ন আকারের পরিণাম) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও মুক্তির) জন্য।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ পুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণই তাঁহার শক্তি প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রালোক যেমন তাঁহার নিজের নহে, সূর্য্য হইতে আহৃত, প্রকৃতির শক্তিও তদ্রূপ পুরুষ হইতে লব্ধ। যোগীদের মতে, সমুদয় ব্যক্ত জগৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; কিন্তু প্রকৃতির নিজের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল পুরুষকে মুক্ত করাই প্রকৃতির প্রয়োজন।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥২২॥

সূত্রার্থ—যিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, কারণ উহা অপরের পক্ষে সাধারণ।

ব্যাখ্যা—আত্মা যে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহা জানানই প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য। যখন আত্মা ইহা জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি আর তাঁহাকে কিছুতেই প্রলোভিত

করিতে পারেন না। যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই সমুদয় প্রকৃতি একেবারে উড়িয়া যায়। কিন্তু অনন্ত কোটি লোক চিরকালই থাকিবেন, যাঁহাদের জন্য প্রকৃতি কার্য্য করিয়া যাইবেন।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩॥

সূত্রার্থ—দৃশ্য ও উহার প্রভু দ্রষ্টার শক্তি-দ্বয়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপ) স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ।

ব্যাখ্যা—এই সূত্রানুসারে যখনই আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হন, তখনই এই সংযোগবশতঃ উভয়ের যথাক্রমে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব এই দুই শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। তখনই এই জগৎ-প্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। অজ্ঞানই এই সংযোগের হেতু। আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের দুঃখ বা সুখের কারণ, শরীরের সহিত আপনার সংযোগ। যদি আমার এই নিশ্চয়জ্ঞান থাকিত যে আমি শরীর নই, তবে আমার শীত, গ্রীষ্ম অথবা আর কিছুরই খেয়াল থাকিত না। এই শরীর একটি সমবায় বা সংহতি মাত্র। আমার এক দেহ, তোমার অন্য দেহ, অথবা সূর্য্য এক পৃথক পদার্থ বলা কেবল গল্পকথামাত্র। সমুদয় জগৎ এক মহাভূতসমুদ্রতুল্য। সেই মহাসমুদ্রের তুমি এক বিন্দু, আমি এক বিন্দু ও সূর্য্য আর এক বিন্দু। আমরা জানি, এই ভূত সর্ব্বদাই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। আজ যাহা

সূর্য্যের উপাদানভূত রহিয়াছে, কাল তাহা আমাদের শরীরের উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।

ব্যাখ্যা—আমরা অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে এক নির্দ্দিষ্ট শরীরে আবদ্ধ করিয়া আমাদের দুঃখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি। এই যে 'আমি শরীর' এই ধারণা, ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারেই আমাদিগকে সুখী দুঃখী করিতেছে। অজ্ঞান-প্রভব এই কুসংস্কার হইতে আমরা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এই সকল বোধ করিতেছি। আমাদের কর্ত্তব্য, এই সংস্কারকে অতিক্রম করা। কি করিয়া ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, যোগী তাহা দেখাইয়া দেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের কোন কোন বিশেষ অবস্থাতে শরীর দগ্ধ হইতেছে, তথাপি যতক্ষণ সেই অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ সে কোন কষ্ট বোধ করিবে না। তবে মনের এইরূপ হঠাৎ উচ্চাবস্থা হয়ত এক নিমিষের জন্য ঝড়ের মত আসিল, আবার পরক্ষণেই চলিয়া গেল। কিন্তু যদি আমরা এই অবস্থা যোগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাভ করি, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বদা শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক রাখিতে পারিব।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং
তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া গেল। ইহাই হান (অজ্ঞানের পরিত্যাগ), ইহাই দ্রষ্টার কৈবল্যপদে অবস্থিতি।

ব্যাখ্যা—যোগশাস্ত্রের মতে আত্মা অবিদ্যাবশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন; প্রকৃতির কবল হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাই সমুদয় ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। আত্মা-মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম্ম. উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, ইহাদেব মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়গুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ কেবল উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। যত দিন না আমরা প্রকৃতির হস্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে পারি, ততদিন আমরা ক্রীতদাসসদৃশ; প্রকৃতি যেমন বলিয়া দেন, আমরা সেইরূপ চলিতে বাধ্য হইয়া থাকি। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন তিনি ভূতকেও বশীভূত করিতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর, সুতরাং উহার ক্ষমতাবিস্তার—উহাকে জয় করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে পারেন, সমুদয় জগৎ তাঁহার বশীভূত হয়। উহা তাঁহার দাসস্বরূপ হইয়া

যায়। রাজযোগ প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। আমরা বাহ্যজগতে যে সকল শক্তির সহিত পরিচিত, তদপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহকে বশে আনিতে হইবে। এই শরীর মনের একটি বাহ্য আবরণ মাত্র। শরীর ও মন যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাহা নহে, উহারা শুক্তি ও তাহার বাহ্য আবরণের মত। উহারা এক বস্তুরই দুইটি বিভিন্ন অবস্থা। শুক্তির আভ্যন্তরীণ পদার্থটি বাহির হইতে নানাপ্রকার উপাদান গ্রহণ করিয়া ঐ বাহ্য আবরণ রচিত করে। মনোনামধেয় এই আন্তরিক সূক্ষ্ম-শক্তিসমূহও বাহির হইতে স্থূল-ভূত লইয়া তাহা হইতে এই শরীররূপ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করিতেছে। সুতরাং যদি আমরা অন্তর্জ্জগৎকে জয় করিতে পারি, তবে বাহ্যজগৎকে জয় করাও সহজ হইয়া আসে। আবার এই দুই শক্তি যে পরস্পর বিভিন্ন তাহা নহে। কতকগুলি শক্তি ভৌতিক ও কতকগুলি মানসিক তাহা নহে। যেমন এই দৃশ্যমান ভৌতিক জগৎ সূক্ষ্মজগতের স্থূল প্রকাশ মাত্র, তদ্রূপ ভৌতিক শক্তিগুলিও সূক্ষ্মশক্তির স্থূল প্রকাশ মাত্র।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—নিরন্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান নাশের উপায়।

ব্যাখ্যা—সমুদয় সাধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসদ্বিবেক—পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা প্রত্যক্ষ করা; এইটি বিশেষরূপে জানা যে পুরুষ ভূতও নন, মনও নন, আর উনি প্রকৃতিও নন,

সুতরাং উহার কোনরূপ পরিণাম অসম্ভব। কেবল প্রকৃতিই সদাসর্ব্বদা পরিণত হইতেছে, সর্ব্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ঘটিতেছে। যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমরা ভেদজ্ঞান লাভ করিব, তখনই অজ্ঞান চলিয়া যাইবে। তখনই পুরুষ আপনার স্বরূপে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—তাঁহার (জ্ঞানীর) বিবেকজ্ঞানের সাতটি উচ্চতম সোপান আছে।

ব্যাখ্যা—যখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন উহা একটির পর আর একটি করিয়া সপ্তস্তরে আইসে। আর যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা আরম্ভ হয়, আমরা তখন নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানলাভ করিতেছি। প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে, মনে এইরূপ উদয় হইবে—"যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি," মনে তখন আর কোনরূপ অসন্তোষ থাকিবে না। যখন আমাদের জ্ঞানপিপাসা থাকে, তখন আমরা ইতস্ততঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। যেখানে কিছু সত্য পাইব বলিয়া মনে হয়, আমরা অমনি তৎক্ষণাৎ তথায় ধাবিত হইয়া থাকি। যখন তথায় উহা প্রাপ্ত না হই, তখনি মনে অশান্তি আসে। অমনি অন্য একদিকে সত্যের অনুসন্ধানে ধাবিত হইয়া থাকি। যতক্ষণ না আমরা অনুভব করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরে, যতদিন না দৃঢ়

ধারণা হয় যে, কেহই আমাদিগকে সত্যলাভ করিতে সাহায্য করিতে পারেন না, আমাদিগকে নিজেনিজেই নিজেকে সাহায্য করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় সত্যান্বেষণই বৃথা। বিবেক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে আমরা যে সত্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছি তাহার প্রথম চিহ্ন এই প্রকাশ পাইবে যে, ঐ পূর্ব্বোক্ত অসন্তোষ-অবস্থা চলিয়া যাইবে। আমাদের নিশ্চয় ধারণা হইবে যে, আমরা সত্য পাইয়াছি---ইহা সত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমরা জানিতে পারিব যে, সত্যস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইতেছেন, আমাদের অজ্ঞানরজনী প্রভাতা হইতেছে। তখন বুকে ভরসা বাঁধিয়া সেই পরমপদ লাভ যতদিন না হয়, ততদিন অধ্যবসায়পরায়ণ হইয়া থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত দুঃখ চলিয়া যাইবে। জগতের বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয়ই তখন আমাদিগকে দুঃখ দিতে পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমরা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইব। চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় কর্ত্তব্যের অন্ত লাভ হইবে। তৎপরে চিত্তবিমুক্তি-অবস্থা আসিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের বিঘ্নবিপত্তি সব চলিয়া গিয়াছে। "যেমন কোন পর্ব্বতের চূড়া হইতে একটি প্রস্তরখণ্ড নিম্ন উপত্যকায় পতিত হইলে আর উহা কখন উপরে যাইতে পারে না, তদ্রূপ মনের চঞ্চলতা, মনঃসংযমের অসামর্থ্য সমুদয় পড়িয়া যাইবে অর্থাৎ চলিয়া যাইবে।" তৎপরের অবস্থা এই হইবে—চিত্ত বুঝিতে পারিবে যে, ইচ্ছামাত্রই উহা স্বকারণে লীন হইয়া যাইতেছে। অবশেষে আমরা দেখিতে

পাইব যে, আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছি; দেখিব যে, এতদিন জগতের মধ্যে কেবল আমরাই একমাত্র অবস্থিত ছিলাম। মন অথবা শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। উহারা ত আমাদিগের সহিত সংযুক্ত কখনই ছিল না। উহারা আপন আপন কাজ আপনারা করিতেছিল, আমরা অজ্ঞানবশতঃ আপনাদিগকে উহাদের সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরাই কেবল সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী ও সদানন্দ-স্বরূপ। আমাদের নিজ আত্মা এতদূর পবিত্র ও পূর্ণ ছিল যে, আমাদের আর কিছুই আবশ্যক ছিল না। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও আবশ্যক ছিল না, কারণ আমরাই সুখস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাইব যে, এই জ্ঞান আর কিছুর উপর নির্ভর করে না। জগতে এমন কিছুই নাই যাহা আমাদের জ্ঞানালোকে প্রকাশ না হইবে। ইহাই যোগীর পরম লক্ষ্য। যোগী তখন ধীর ও শান্ত হইয়া যান, আর কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করেন না। তিনি আর কখনও অজ্ঞান-মোহে ভ্রান্ত হন না, দুঃখ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি জানিতে পারেন যে, আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, নিত্যপূর্ণস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক-
খ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—পৃথক্ পৃথক্ যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে

করিতে যখন অপবিত্রতা লয় হইয়া যায়, তখন জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ; উহার শেষ সীমা বিবেকখ্যাতি।

ব্যাখ্যা—এক্ষণে সাধনের কথা বলা হইতেছে। এতক্ষণ যাহা বলা হইতেছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যাপার। উহা আমাদের অনেক দূরে। কিন্তু উহাই আমাদের আদর্শ, আমাদিগের উহাই একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতে হইলে, প্রথমতঃ শরীর ও মনকে সংযত করা আবশ্যক। তখন পূর্ব্বোক্ত উচ্চতর লক্ষ্য বাস্তবিক অপরোক্ষ পথে আসিয়া স্থায়ী হইতে পারে। আমাদের আদর্শ লক্ষ্য কি তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি ; এক্ষণে উহা লাভের জন্য সাধন আবশ্যক।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-
সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গস্বরূপ।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এইগুলিকে যম বলে।

ব্যাখ্যা—পূর্ণ যোগী হইতে গেলে, তাঁহাকে লিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই, তবে তিনি লিঙ্গাভিমান দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিবেন কেন? আমরা

পরে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই সকল ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চৌর্য্য যেমন অসৎকার্য্য, পরিগ্রহ অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে গ্রহণও তদ্রূপ অসৎ কর্ম্ম। যিনি অপরের নিকট হইতে কোনরূপ উপহার গ্রহণ করেন, তাঁহার মনের উপর উপহারদাতার মন কার্য্য করে, সুতরাং যিনি উহা গ্রহণ করেন, তাঁহার ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অপরের নিকট হইতে উপহার গ্রহণে মনের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা ক্রীতদাসতুল্য অধীন হইয়া পড়ি। অতএব কিছু গ্রহণ করা উচিত নহে।

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ
সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—এইগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় অর্থাৎ উদ্দেশ্যদ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলে সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলিয়া কথিত হয়।

ব্যাখ্যা—এই সাধনগুলি অর্থাৎ এই অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে জাতি, দেশ অথবা অবস্থানির্ব্বিশেষে অনুষ্ঠেয়।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-
প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—বাহ্য ও অন্তঃশৌচ, সন্তোষ, তপস্যা,

স্বাধ্যায় (মন্ত্রজপ, স্তোত্র বা অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ) ও ঈশ্বরোপাসনা এইগুলি নিয়ম।)

ব্যাখ্যা—বাহ্যশৌচ অর্থে শরীরকে শুচি রাখা; অশুচি ব্যক্তি কখনও যোগী হইতে পারে না। এই বাহ্যশৌচের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবশ্যক। সমাধিপাদ ৩৩শ সূত্রে যে ধর্ম্মগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ আসে। অবশ্য বাহ্যশৌচ হইতে অন্তঃশৌচ অধিকতর উপকারী, কিন্তু উভয়টিরই প্রয়োজনীয়তা আছে; আর অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহ্যশৌচ কোন ফলোপধায়ক হয় না।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে, তাহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মের কথা বলা হইল তাহাদের অভ্যাসের উপায়—মনে বিপরীত প্রকারের চিন্তা আনয়ন করা। যখন অন্তরে চৌর্য্যের ভাব আসিবে, তখন অচৌর্য্যের চিন্তা করিতে হইবে। যখন দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বসূত্রে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনার কথা বলা

হইয়াছে, তাহার প্রণালী এইরূপ—বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসা আদি; কৃত, কারিত অথবা অনুমোদিত; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ, অথবা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই হউক; উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; এইরূপ ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ ভাবনা বলে।

ব্যাখ্যা—আমি নিজে কোন মিথ্যা কথা বলিলে তাহাতে যে পাপ হয়, যদি আমি অপরকে মিথ্যা কথা কহিতে প্রবৃত্ত করি, অথবা অপরে মিথ্যা কহিলে তাহাতে অনুমোদন করি, তাহাতেও তুল্য পরিমাণে পাপ হয়। যদিও উহা সামান্য মিথ্যা হউক, তথাপি উহা যে মিথ্যা তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পর্ব্বতগুহায় বসিয়াও যদি তুমি কোন পাপ চিন্তা করিয়া থাক, যদি কাহার প্রতি অন্তরে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাক তাহা হইলে তাহাও সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপরে গিয়া প্রতিঘাত করিবে, একদিন না একদিন কোন না কোন প্রকার দুঃখের আকারে উহা প্রবল বেগে তোমাকে আক্রমণ করিবে। তুমি যদি হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার ঈর্ষা ও ঘৃণার ভাব পোষণ কর ও উহা তোমার হৃদয় হইতে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ কর, তবে উহা সুদ সমেত তোমার উপর গিয়া পড়িবে। জগতের কোন শক্তিই উহা নিবারণ করিতে পারিবে না। যখন তুমি একবার ঐ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্য

তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। এইটি স্মরণ থাকিলে, তোমাকে অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখিবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকট অপরে আপনাদের স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ করে।

ব্যাখ্যা—যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার চরমাবস্থা লাভ করেন, তবে তাঁহার সম্মুখে যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃই হিংস্র তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাঘ্র ও মেষ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে তোমার অহিংসাব্রত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—যখন সত্যব্রত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নিজের জন্য বা অপরের জন্য কোন কর্ম্ম না করিয়াই তাহার ফল লাভ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্নে পর্য্যন্ত তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন কায়মনোবাক্যে সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা ভাষণ করিবে না, তখন (এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে) তুমি যাহা বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি যদি কাহাকেও বল, 'তুমি

কৃতার্থ হও,' সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বল, 'রোগমুক্ত হও,' সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়া যাইবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ—অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই যোগীর নিকট সমুদয় ধন-রত্নাদি আসিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের ইচ্ছা করিবে, সে ততই তোমার অনুসরণ করিবে; আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয়।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি-মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। উহা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি আর কিছুতেই হইতে পারে না। যত মহামহা মস্তিষ্কশালী পুরুষ দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যবান ছিলেন। ইহা দ্বারা মানুষের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা লাভ করা যায়। মানবসমাজের নেতৃগণ সকলেই ব্রহ্মচর্য্যবান ছিলেন, তাঁহাদের সমুদয় শক্তি এই ব্রহ্মচর্য্য হইতেই লাভ হইয়াছিল; অতএব যোগীর ব্রহ্মচর্য্যবান হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—অপরিগ্রহ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে, পূর্ব্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

ব্যাখ্যা—যোগী যখন অপরের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ না করেন, তখন তাঁহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা না থাকাতে তিনি স্বাধীন ও মুক্তস্বভাব হইয়া যান। তাঁহার মন শুদ্ধ হইয়া যায়, কারণ দানগ্রহণ করিতে গেলে দাতার পাপ গ্রহণ করিতে হয়। উহা মনের উপর স্তরে স্তরে লাগিয়া থাকে, সুতরাং উহা সর্ব্বপ্রকার পাপের আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে। এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইয়া যায়, আর ইহা হইতে যে সকল ফললাভ হয়, তন্মধ্যে পূর্ব্বজন্ম স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়া প্রথম। তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজ লক্ষ্যে দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পান যে, এত দিন তিনি কেবল যাওয়া-আসা করিতেছিলেন। তিনি তখন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূঢ় হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, আমি আর যাওয়া-আসা করিব না, আর প্রকৃতির দাস হইব না।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়, পরের সহিতও সঙ্গ করিতে আর প্রবৃত্তি থাকে না।

ব্যাখ্যা—যখন বাস্তবিক বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অযত্ন আইসে, উহাকে

কিসে ভাল রাখিব, কিসেই বা উহা সুন্দর দেখাইবে, এ সকল ভাব একেবারে চলিয়া যায়। অপরে যাহাকে অতি সুন্দর মুখ বলিবে তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জগতের লোকে যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহার পশ্চাতে চৈতন্য প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বর্গীয় মুখশ্রী বলিবেন। এই দেহতৃষ্ণা মনুষ্যজীবনের এক মহা উপদ্রব। সুতরাং শৌচপ্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই প্রকাশ পাইবে যে, তুমি আপনাকে আর একটি শরীরমাত্র বলিয়া ভাবিতে পারিবে না। যখন এই পবিত্রতা আমাদের মধ্যে বাস্তবিক প্রবেশ করে, তখনই আমরা এই দেহ-ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি।

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়-
জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—এই শৌচ হইতে সত্ত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—এই শৌচ অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্ব পদার্থ বর্দ্ধিত হইবে, সুতরাং মনও একাগ্র ও সন্তোষপূর্ণ হইবে। তুমি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছ, ইহার প্রথম লক্ষণ এই দেখিবে যে, তুমি বেশ সন্তোষলাভ করিতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অবশ্য অজীর্ণ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম নহে। সুখই সত্ত্বের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; সাত্ত্বিক ব্যক্তির পক্ষে সমুদয়ই সুখময়

বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যখন তোমার এই আনন্দের ভাব আসিতে থাকিবে তখন তুমি বুঝিবে যে, তুমি যোগে খুব উন্নতি করিতেছ। কষ্ট যাহা কিছু, সকলই তমোগুণ-সম্ভব; সুতরাং ঐ কষ্ট যাহাতে নাশ হয়, তাহা করিতে হইবে। অতিশয় বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া মুখ ভার করিয়া রাখা তমোগুণের একটি লক্ষণ। সবল, দৃঢ়, সুস্থকায়, যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত। যোগীর পক্ষে সমুদয়ই সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তিনি যে কোন মনুষ্যমূর্তি দেখেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দ উদয় হয়। ইহাই ধার্মিক লোকের চিহ্ন। পাপই কষ্টের কারণ, আর কোন কারণ হইতে কষ্ট আসে না। বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা কি ভয়ানক দৃশ্য! এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না। কোন দিন এইরূপ হইলে, দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া কাটাইয়া দাও। জগতের ভিতর এই ব্যাধি সংক্রামিত করিয়া দিবার তোমার কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, তখন তুমি সমুদয় শরীরটাকে বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর তুমি এই যন্ত্রের দাস থাকিবে না; এই দেহযন্ত্রই তোমার দাসবৎ হইয়া থাকিবে। এই দেহযন্ত্র আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া নিম্নদিকে না লইয়া গিয়া উহাই তাহার মুক্তিপথে মহান সহায় হইবে।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—সন্তোষ হইতে পরম সুখলাভ হয়।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ—অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্যা হইতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার শক্তি আসে।

ব্যাখ্যা—তপস্যার ফল কখন কখন সহসা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—মন্ত্রাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—যে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী (দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ) দেখিবার ইচ্ছা করিবে, অভ্যাসও সেই পরিমাণে অধিক করিতে হইবে।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ—ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ঈশ্বরে নির্ভরের দ্বারা সমাধি ঠিক পূর্ণ হয়।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ—যে ভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায়, তাহার নাম আসন।

ব্যাখ্যা—এক্ষণে আসনের কথা বলা হইবে। যতক্ষণ তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্যান্য সাধনে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবে না। আসন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই, তুমি শরীরের সত্তা

মোটেই অনুভব করিতে পারিবে না। এইরূপ হইলেই বাস্তবিক আসন দৃঢ় হইয়াছে, বলা যায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে তুমি যদি কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে চেষ্টা কর, তোমার নানাপ্রকার বিঘ্ন আসিতে থাকিবে। কিন্তু যখনই তুমি এই স্থূলদেহভাববিবর্জ্জিত হইবে, তখন তোমার শরীরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভূত হইবে না। আর তুমি সুখ অথবা দুঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার যখন তোমার শরীরের জ্ঞান আসিবে, তখন তুমি অনুভব করিবে যে, আমি অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। যদি শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা এইরূপেই হইতে পারে। যখন তুমি এইরূপে শরীরকে নিজ অধীন করিয়া উহাকে দৃঢ় রাখিতে পারিবে, তখন তোমার সাধন দৃঢ় হইয়াছে জানিবে। কিন্তু যতক্ষণ তোমার শারীরিক বিঘ্নবাধাগুলি আসিতে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার স্নায়ুমণ্ডলী চঞ্চল থাকিবে এবং তুমি কোনরূপে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারিবে না।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ—শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রযত্ন আছে, তাহা শিথিল করিয়া দিয়া ও অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হইতে পারে।

ব্যাখ্যা—অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন অবিচলিত হইতে পারে। অবশ্য আমরা সেই সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত অনন্ত (ব্রহ্ম)

সম্বন্ধে (সহজে) চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু আমরা অনন্ত আকাশের বিষয় চিন্তা করিতে পারি।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ—এইরূপে আসন জয় হইলে, তখন দ্বন্দ্ব-পরম্পরা আর কিছু বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা—দ্বন্দ্ব অর্থে শুভ-অশুভ, শীত-উষ্ণ, আলোক-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিপরীতধর্ম্মক দুই দুই পদার্থ। এগুলি আর তখন তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ
প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ—এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত করাকে প্রাণায়াম বলে।

ব্যাখ্যা—যখন এই আসন জিত হয়, তখন এই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিভঙ্গ (অভাব) করিয়া দিয়া উহাকে জয় করিতে হইবে, সুতরাং, এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম কি? না—শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে আনয়ন। যদিও প্রাণ শব্দ সচরাচর শ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু বাস্তবিক উহা শ্বাস নহে। প্রাণ অর্থে জাগতিক সমুদয় শক্তি-সমষ্টি। উহা প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শক্তিস্বরূপ, আর উহার আপাতপ্রতীয়মান প্রকাশ—এই ফুস্‌ফুসের গতি। প্রাণ যখন শ্বাসকে ভিতর দিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গতি

আরম্ভ হয়; প্রাণায়াম করিবার সময় আমরা উহাকেই সংযম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এই প্রাণের উপর শক্তিলাভ করিতে হইলে, আমরা প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাসকে সংযম করিতে আরম্ভ করি, কারণ উহাই প্রাণজয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ
পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ভেদে এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম হওয়াতে উহাদেরও আবার নানাপ্রকার ভেদ আছে।

ব্যাখ্যা—এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত। প্রথম—যখন আমরা শ্বাসকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ ও ধারণ করি; দ্বিতীয়—যখন আমরা উহা বাহিরে প্রক্ষেপ ও ধারণ করি; তৃতীয়—যখন শ্বাস ও প্রশ্বাস ফুস্ফুসের মধ্যে বা বাহিরে ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়া ধৃত হয়। উহারা আবার দেশ, কাল ও সংখ্যা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। দেশ অর্থে—প্রাণকে শরীরের কোন অংশবিশেষে আবদ্ধ রাখা (অথবা তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করা)। সময় অর্থে—প্রাণ কোন্ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, এবং সংখ্যা অর্থে—কতবার ঐরূপ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে। এই জন্য কোথায়, কতক্ষণ ও কতবার রেচকাদি করিতে হইবে, ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়ামের ফল উদ্ঘাত অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সূত্রার্থ—চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম এই যে, যাহাতে প্রাণায়ামের সময় বাহ্য বা আভ্যন্তর গতির অভাব হয়।

ব্যাখ্যা—ইহা চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত চিন্তাসহকৃত দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা স্বাভাবিক কুম্ভক (স্তম্ভবৃত্তি) হইয়া থাকে। অন্য প্রাণায়ামগুলিতে চিন্তার সংস্রব নাই।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

সূত্রার্থ—তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—চিত্তে স্বভাবতঃই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহা সত্ত্বপদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, উহা কেবল রজঃ ও তমোদ্বারা আবৃত হইয়া আছে। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের এই আবরণ চলিয়া যায়।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

সূত্রার্থ—(তাহা হইতেই) ধারণায় মনের যোগ্যতা হয়।

ব্যাখ্যা—এই আবরণ চলিয়া গেলে আমরা মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকি।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকার
ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

সূত্রার্থ—যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ

বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলা যায়।

ব্যাখ্যা—এই ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক ঐ পুস্তকাকৃতি বাহিরে নাই। উহা কেবল মনে অবস্থিত। বাহিরের কোন কিছু ঐ আকৃতিটিকে জাগাইয়া দেয় মাত্র; বাস্তবিক উহা চিত্তেই আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলি, যাহা তাহাদের সম্মুখে আসিতেছে, তাহাদেরই সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদেরই আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পার, তবে তোমার মন শান্ত হইবে এবং ইন্দ্রিয়গুলিও মনের অনুরূপ হইবে। ইহাকেই প্রত্যাহার বলে।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

সূত্রার্থ—তাহা হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বহির্বস্তুর আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পারেন ও মনের সহিত উহা-দিগকে এক করিয়া ধারণ করিতে কৃতকার্য্য হন, তখনই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে। আর যখনই ইন্দ্রিয়গণ জিত হয়, তখনই সমুদয় স্নায়ু, সমুদয় মাংসপেশী পর্য্যন্ত আমাদের বশে আসিয়া থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়গণই সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি ও কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ। এই ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়

এই দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং যখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইবে, তখন যোগী সর্ব্বপ্রকার ভাব ও কার্য্যকে জয় করিতে পারিবেন। সমুদয় শরীরটিই তাঁহার অধীন হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থা-লাভ হইলেই মানুষ দেহধারণে আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে যথার্থ সত্যভাবে বলিতে পারে "আমি জন্মিয়াছিলাম বলিয়া আমি সুখী।" যখন ইন্দ্রিয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, এই শরীর যথার্থই অতি অদ্ভুত পদার্থ।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভূতি-পাদ

এক্ষণে বিভূতি-পাদ আসিল।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা।

ব্যাখ্যা—যখন মন শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন বস্তুতে সংলগ্ন হয় ও কিছুকাল ঐ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণা বলে।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাহাকে ধ্যান বলে।

ব্যাখ্যা—মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন একটি বিশেষ স্থানে যথা, মস্তকের উপরে, অথবা হৃদয় ইত্যাদি স্থানে আপনাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি মন শরীরের কেবল ঐ অংশ দিয়াই সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের আর সমুদয় ভাগকে যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে, তবে তাহার নাম ধারণা; আর যখন আপনাকে খানিকক্ষণ ঐ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম ধ্যান।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধি ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—তাহাই যখন সমুদয় বাহ্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থ-মাত্রকে প্রকাশ করে, তখন সমাধি আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—যখন ধ্যানে বস্তুর আকৃতি বা বাহ্যভাগ পরিত্যক্ত হয়, তখনই এই সমাধি অবস্থা আসে। মনে কর, আমি এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছি; মনে কর, যেন আমি উহার উপর চিত্তসংযম করিতে কৃতকার্য্য হইলাম, তখন কেবল কোনরূপ আকারে অপ্রকাশিত অর্থনামধেয় আভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলি আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইরূপ ধ্যানের অবস্থাকে সমাধি বলে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ এক বস্তুর সম্বন্ধেই অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাকে সংযম বলে।

ব্যাখ্যা—যখন কেহ তাঁহার নিজের মনকে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে লইয়া গিয়া সেই বস্তুর উপর কিছুক্ষণের জন্য ধারণ করিতে পারেন, পরে তাহার অন্তর্ভাগকে উহার বাহ্য আকার হইতে পৃথক করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারেন, তখনই সংযম হইল। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সমুদয়গুলি একটির পর আর একটি ক্রমান্বয়ে এক বস্তুর উপরে হইলে একটি সংযম হইল। তখন বস্তুর বাহ্য আকারটি কোথায় চলিয়া যায়, মনে কেবল তাহার অর্থমাত্র উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—এই সংযমের দ্বারা যোগীর জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়।

ব্যাখ্যা—যখন কোন ব্যক্তি এই সংযমসাধনে কৃতকার্য্য হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার হস্তে আসিয়া থাকে। এই সংযমই যোগীর জ্ঞানলাভের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ। জ্ঞানের বিষয় অনন্ত। উহারা স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম; সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত। এই সংযম প্রথমতঃ স্থূল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হয়, আর যখন স্থূলের জ্ঞানলাভ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া সোপানক্রমে উহা সূক্ষ্মতর বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ করা উচিত।

ব্যাখ্যা—খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই সূত্র এইরূপ সাবধান করিয়া দিতেছে।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—এই তিনটি যোগীর পূর্ব্বকথিত সাধনগুলি হইতে অধিক অন্তরঙ্গ সাধন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে। উহারা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি

হইতে বহিরঙ্গ। এই ধারণাদি অবস্থা লাভ করিলে অবশ্য মানুষ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা ত মুক্তি নহে। কেবল ঐ ত্রিবিধ সাধন দ্বারা মন নির্ব্বিকল্পক অর্থাৎ পরিণামশূন্য হইতে পারে না, ঐ ত্রিবিধ সাধন আয়ত্ত হইলেও দেহধারণের বীজ থাকিয়া যাইবে। যখন সেই বীজগুলি, যোগীদের ভাষায় যাহাকে ভর্জ্জিত বলে, তাহাই হইয়া যায়, তখন তাহাদের পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন করিবার উপযোগী শক্তিটি নষ্ট হইয়া যায়। শক্তিসমূহ কখনই বীজগুলিকে ভর্জ্জিত করিতে পারে না।

তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—কিন্তু এই সংযমও নির্ব্বীজ সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—এই কারণে নির্ব্বীজ সমাধির সহিত তুলনা করিলে এইগুলিকেও বহিরঙ্গ বলিতে হইবে। সংযম লাভ হইলে আমরা বস্তুতঃ সর্ব্বোচ্চ সমাধি অবস্থা লাভ না করিয়া একটি নিম্নতর ভূমিতে মাত্র অবস্থিত থাকি। সেই অবস্থায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিদ্যমান থাকে, সিদ্ধিসকল এই জগতেরই অন্তর্গত।

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—যখন ব্যুত্থান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের

অভিভব (নাশ) ও নিরোধ-সংস্কারের আবির্ভাব হয়, তখন চিত্ত নিরোধনামক অবসরের অনুগত হয়, উহাকে নিরোধপরিণাম বলে।

ব্যাখ্যা—ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে; কারণ তাহা হইলে কোন প্রকার বৃত্তিই থাকিত না। মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদয় হইয়াছে, যাহাতে মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, আর যোগী ঐ বৃত্তিকে সংযম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ অবস্থায় ঐ সংযমটিকেও একটি বৃত্তি বলিতে হইবে। একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গের দ্বারা নিবারিত হইল, সুতরাং উহা সর্ব্বতরঙ্গের নিবৃত্তিরূপ সমাধি নহে, কারণ ঐ সংযমটিও একটি তরঙ্গ। তবে যে অবস্থায় মনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষা এই নিম্নতর সমাধি সেই উচ্চতর সমাধির নিকটবর্ত্তী বটে।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়।

ব্যাখ্যা—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে ও সদাসর্ব্বদা একাগ্রতার শক্তি লাভ করিলে মনের এই নিয়ত সংযম প্রবাহাকারে চলিতে থাকে ও উহার স্থিরতা হয়।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য
সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—মনে সর্ব্বপ্রকার বস্তু গ্রহণ করা ও একাগ্রতা—এই দুইটি যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলে।

ব্যাখ্যা—মন সর্ব্বদাই নানাপ্রকার বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকার বস্তুতেই যাইতেছে। আবার মনের এমন একটি উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে, যখন উহা একটিমাত্র বস্তু গ্রহণ করিয়া আর সকল বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে। এই এক বস্তু গ্রহণ করার ফল সমাধি।

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকা-
গ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—যখন মন শান্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত ও বর্ত্তমান উভয় অবস্থাতেই তুল্য-প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে।

ব্যাখ্যা—মন একাগ্র হইয়াছে, কি করিয়া জানা যাইবে? মন একাগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না। যতই সময়ের জ্ঞান চলিয়া যায়, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি, বুঝিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমরা খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্ন হই, তখন সময়ের দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না; যখন আবার পুস্তক-পাঠে বিরত হই, তখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, কতখানি সময় অমনি চলিয়া গিয়াছে। সমুদয় সময়টি যেন একত্রিত হইয়া

বর্ত্তমানে একীভূত হইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, যতই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আসিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, মন ততই একাগ্র হইয়া থাকে।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—ইহার দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইল।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব তিনটি সূত্রে যে চিত্তের নিরোধাদি পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ তিন প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা করা হইল। মন ক্রমাগত বৃত্তিরূপে পরিণত হইতেছে, ইহা মনের ধর্ম্মরূপ পরিণাম। উহা যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মধ্য দিয়া চলিতেছে, ইহাই মনের লক্ষণরূপ পরিণাম; আর কখনও যে নিরোধ-সংস্কার প্রবল ও ব্যুত্থান-সংস্কার দুর্ব্বল অথবা তাহার বিপরীত হয়, ইহা মনের অবস্থারূপ পরিণাম। মনের এই পরিণামত্রয়ের ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ত্রিবিধ পরিণামও বুঝিতে হইবে। যথা, মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর পিণ্ডরূপ ধর্ম্ম গিয়া উহাতে যে ঘটাকার ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়, তাহা ধর্ম্ম-পরিণাম। ঐ ঘটের বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থারূপ পরিণামকে লক্ষণ-পরিণাম এবং উহার নূতনত্ব ও পুরাতনত্বাদি অবস্থারূপ পরিণামকে অবস্থা-পরিণাম বলে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে যে সকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য, যোগী যাহাতে মনের পরিণামগুলির উপর ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পারেন। তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত সংযমশক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত (বর্ত্তমান) ও অব্যপদেশ্য (ভবিষ্যৎ) ধর্ম্ম যাহাতে অবস্থিত তাহার নাম ধর্ম্মী।

ব্যাখ্যা—ধর্ম্মী তাহাকেই বলে, যাহার উপর কাল ও সংস্কার কার্য্য করিতেছে, যাহা সর্ব্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত ও ব্যক্তভাব ধারণ করিতেছে।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের বিভিন্নতা (পূর্ব্বাপর পার্থক্য)।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম করিলে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে সংযমের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, আমরা তাহা যেন বিস্মৃত না হই। যখন মন বস্তুর বাহ্যভাগকে পরিত্যাগ করিয়া উহার আভ্যন্তরীণ ভাবগুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ

অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকেই সংযম বলে। এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে কেবল সংস্কারের পরিণামগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। কতকগুলি সংস্কার বর্ত্তমান অবস্থায় কার্য্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে আর কতকগুলি এখনও ফল প্রদান করিবে বলিয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। এইগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিয়া তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় জানিতে পারেন।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগ-সংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের আরোপ জন্য এইরূপ সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে সমুদয় ভূতের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—শব্দ বলিলে বাহ্যবিষয়—যাহাতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে। অর্থ বলিলে যে শরীরাভ্যন্তরীণ প্রবাহ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা লব্ধ বিষয়াভি-ঘাতজনিত বেদনাকে লইয়া গিয়া মস্তকে পঁহুছিয়া দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে, আর জ্ঞান বলিলে মনের যে প্রতিক্রিয়া, যাহা হইতে বিষয়ানুভূতি হয় তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় উৎপন্ন হয়।

মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দ্দেশে এক কম্পন হইল, তৎপরে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা মনে একটি বোধপ্রবাহ গেল, তৎপরে মন প্রতিঘাত করিল, আমি শব্দটিকে জানিতে পারিলাম। আমি ঐ যে শব্দটিকে জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ—প্রথম কম্পন, দ্বিতীয় অনুভূতিপ্রবাহ ও তৃতীয় প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ, এই তিনটি ব্যাপারকে পৃথক করা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহাদিগকে পৃথক করিতে পারেন। যখন মানুষ এই কয়েকটিকে পৃথক করিবার শক্তিলাভ করে, তখন সে যে কোন শব্দের উপর সংযমপ্রয়োগ করে, অমনিই যে অর্থপ্রকাশের জন্য ঐ শব্দ উচ্চারিত, তাহা মনুষ্যকৃতই হউক বা অন্য কোন প্রাণীকৃতই হউক, তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—সংস্কারগুলিকে প্রত্যক্ষ করিলে অর্থাৎ উহাদিগকে জানিতে পারিলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, সমুদয়ই আমাদের চিত্তে তরঙ্গাকারে আসিয়া থাকে, উহা আবার চিত্তের অভ্যন্তরে মিলাইয়া যায়, ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। উহা তথায় যাইয়া অতি সূক্ষ্ম আকারে অবস্থান করে, যদি আমরা ঐ তরঙ্গটিকে পুনরায় আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই স্মৃতি হইল। সুতরাং যোগী যদি মনের এই সমস্ত পূর্ব্বসংস্কারের উপর সংযম করিতে

পারেন, তবে তিনি পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে আরম্ভ করিবেন।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—অপরের শরীরের যে সকল চিহ্ন আছে, তাহাতে সংযম করিলে সেই ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়।

ব্যাখ্যা—প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই বিশেষ বিশেষ প্রকার চিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক করা যায়। যখন যোগী কোন ব্যক্তির এই বিশেষ চিহ্নগুলির উপর সংযম করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির মনের অবস্থা জানিতে পারেন।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—কিন্তু ঐ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহা জানিতে পারেন না, কারণ, উহা তাঁহার সংযমের বিষয় নহে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে যে শরীরের উপর সংযমের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহার মনের ভিতরে তখন কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারা যায় না। এখানে দুইবার সংযম করিবার আবশ্যক হইবে, প্রথম শরীরের লক্ষণসমূহের উপর ও তৎপরে মনের উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগী সেই ব্যক্তির মনের সমুদয় ভাব জানিতে পারিবেন।

কায়রূপসংযমাত্তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে
চক্ষুঃপ্রকাশাঽসংযোগেঽন্তর্দ্ধানম্ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া, ঐ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তি স্তম্ভিত ও চক্ষুর প্রকাশশক্তির সহিত উহার অসংযোগ হইলে যোগী লোকসমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন।

ব্যাখ্যা—মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের ভিতর দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন। তিনি যে বাস্তবিক অন্তর্হিত হন তাহা নহে, তবে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না এই মাত্র। শরীরের আকৃতি ও শরীর এই দুইটিকে তিনি যেন পৃথক করিয়া ফেলেন। এটি যেন স্মরণ থাকে যে যোগী যখন এরূপ একাগ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তুর আকার ও তদাকার-বিশিষ্ট বস্তুকে পরস্পর পৃথক করিতে পারেন, তখন ঐরূপ অন্তর্দ্ধানশক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহার উপর অর্থাৎ আকার ও সে আকারবান্ বস্তুর পার্থক্যের উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে ঐ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তির উপর যেন একটি বাধা পড়ে, কারণ, বস্তুর আকৃতি ও আকারবান্ সেই পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলেই আমরা বস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারি।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্দ্ধানমুক্তম্ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—ইহা দ্বারাই শব্দাদির অন্তর্দ্ধান অর্থাৎ

শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে না দেওয়া ব্যাখ্যা করা হইল।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাদ-
পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—কর্ম্ম দুই প্রকার, যাহার ফল শীঘ্র লাভ হইবে ও যাহা বিলম্বে ফলপ্রসব করিবে। ইহাদের উপর সংযম করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক মৃত্যুলক্ষণসমূহের উপর সংযমপ্রয়োগ করিলে যোগীরা দেহত্যাগের সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী তাঁহার নিজ কর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার মনের ভিতর যে সংস্কারগুলির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি ফল-প্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের দ্বারা জানিতে পারেন, কবে তাঁহার শরীরপাত হইবে। কোন্ সময়ে, কোন্ দিন, কটার সময়ে, এমন কি কত মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহা তিনি জানিতে পারেন। হিন্দুরা মৃত্যুর এই আসন্নবর্ত্তিতা জানাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকেন, কারণ, গীতাতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, মৃত্যুসময়ের চিন্তা পরজীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণস্বরূপ।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—মৈত্রী ইত্যাদি গুণগুলির উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে, ঐ গুণগুলি অতিশয় প্রবল ভাব ধারণ করে।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—হস্তী ইত্যাদির বলের উপর সংযমপ্রয়োগ করিলে যোগিগণের শরীরে সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল আসে।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী এই সংযমশক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল ইচ্ছা করেন এবং হস্তীর বলের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপায় জানে, তবে ঐ শক্তি লইয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। যোগী যিনি, তিনি উহা লাভ করিবার বিদ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিত-
বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—(পূর্ব্বকথিত) মহা-জ্যোতির উপর সংযম করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্ত্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি দূরবর্ত্তী বস্তুও তিনি দেখিতে পান। যদি কোন

বস্তু পাহাড়ের আড়ালে থাকে, তাহা এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুও তিনি জানিতে পারেন।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—সূর্য্যে সংযমের দ্বারা সমুদয় জগতের জ্ঞানলাভ হয়।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহের জ্ঞান-লাভ হয়।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—ধ্রুবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের গতিজ্ঞান হয়।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহ-জ্ঞানম্ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে শরীরের গঠন জানা যায়।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কণ্ঠকূপে চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে তাঁহার ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া যায়।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—কূর্ম্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের স্থিরতা আসে।

ব্যাখ্যা—যখন তিনি সাধনা করেন, তাঁহার শরীর চঞ্চল হয় না।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—মস্তকের জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ হয়।

ব্যাখ্যা—সিদ্ধ বলিতে এস্থলে ভূতযোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চযোনিকে বুঝাইতেছে। যোগী যখন তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে মনঃসংযম করেন, তখন তিনি এই সিদ্ধগণকে দর্শন করেন। এখানে সিদ্ধ শব্দে মুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না। কিন্তু অনেক সময় উহা ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—অথবা প্রতিভাশক্তিদ্বারা সমুদয় জ্ঞান লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—যাঁহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানবিশেষ আছে, তাঁহাদের কোন প্রকার সংযম ব্যতীতই এই সমুদয় জ্ঞান আসিতে পারে। যখন মানুষ উচ্চ প্রতিভাশক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি এই মহা আলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার জ্ঞানে সমুদয় প্রকাশিত হইয়া যায়। তাঁহার

কোন প্রকার সংযম না করিয়াই, আপনা আপনিই সমুদয় জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

হৃদয়ে চিত্তসম্বিদ্ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্
ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥৩৬॥

সূত্রার্থ—পুরুষ ও বুদ্ধি, যাহারা অতিশয় পৃথক তাহাদের বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে, সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপর বা পুরুষের জন্য। বুদ্ধির অন্য এক অবস্থার নাম স্বার্থ; উহার উপর সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—পুরুষ ও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহার সহিত আপনাকে অভেদভাবাপন্ন মনে করে এবং তাহাতেই আপনাকে সুখী বা দুঃখী বোধ করিয়া থাকে। বুদ্ধির এই অবস্থাকে পরার্থ বলে, কারণ, উহার সমুদয় ভোগ নিজের জন্য নহে, পুরুষের জন্য। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধির আর এক অবস্থা আছে— উহার নাম স্বার্থ। যখন বুদ্ধি সত্ত্বপ্রধান হইয়া অতিশয় নির্ম্মল হয় তখন তাহাতে পুরুষ বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হন, এবং সেই বুদ্ধি অন্তর্ম্মুখী হইয়া পুরুষমাত্রাবলম্বন হয়।

সেই স্বার্থনামক বুদ্ধিতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। পুরুষ-মাত্রাবলম্বন-বুদ্ধিতে সংযম করিতে বলার উদ্দেশ্য এই—শুদ্ধ পুরুষ জ্ঞাতা বলিয়া কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণ-বেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ—তাহা হইতে প্রাতিভ শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—ইহারা সমাধির সময়ে উপসর্গ, কিন্তু সংসার অবস্থায় উহারা সিদ্ধির স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—যোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ও মনের যোগের দ্বারা হইয়া থাকে, যদি তিনি 'আত্মা ও প্রকৃতি পরস্পর পৃথক্ বস্তু' এই সত্যের উপর চিত্তসংযম করিতে পারেন, তবে তিনি পুরুষের জ্ঞানলাভ করেন। তাহা হইতে বিবেকজ্ঞান উদয় হইয়া থাকে। যখন তিনি এই বিবেকলাভ করিতে কৃতকার্য্য হন, তখন তাঁহার মহোচ্চ দৈবজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই শক্তিসমুদয় সেই উচ্চতম লক্ষ্য অর্থাৎ সেই পবিত্রস্বরূপ আত্মার জ্ঞান ও মুক্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। এগুলি পথিমধ্যে লব্ধ হইয়া থাকে মাত্র। যোগী যদি এই শক্তিগুলিকে পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি সেই উচ্চতম জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্তিগুলি লাভ করিতে প্রলোভিত হন, তবে তাঁহার অধিক উন্নতি হয় না।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ
চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—যখন বন্ধের কারণ শিথিল হইয়া যায় ও চিত্তের প্রচারস্থানগুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে) অবগত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা—যোগী অন্য এক দেহে অবস্থান করিয়া তদ্দেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও কোন এক মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে গতিশীল করিতে পারেন। অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিতে পারেন ও সেই সময়ের জন্য সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে পারেন। প্রকৃতিপুরুষের বিবেকলাভ করিলেই ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে সেই শরীরে সংযম প্রয়োগ করিলেই ইহা সিদ্ধ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মা যে কেবল সর্ব্বব্যাপী তাহা নহে, তাঁহার মনও (অবশ্য যোগীদিগের মতে) সর্ব্বব্যাপী, উহা সেই সর্ব্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র। এক্ষণে কিন্তু উহা কেবল এই শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু যোগী যখন স্নায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারেন, তখন তিনি অন্যান্য শরীরের দ্বারাও কার্য্য করিতে পারেন।

উদান-জয়াজ্জল-পঙ্ক-কণ্টকাদিম্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥৪০॥

সূত্রার্থ—উদান-নামক স্নায়ুপ্রবাহজয়ের দ্বারা যোগী জলে বা পঙ্কে মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন।

ব্যাখ্যা—উদান নামক যে স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ফুসফুস্ ও শরীরের উপরিস্থ সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন তাহাকে জয় করিতে পারেন, তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারেন, অগ্নির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পারেন, এবং ইচ্ছামাত্রেই এই শরীর ত্যাগ করিতে পারেন।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—সমান বায়ুকে জয় করিলে তিনি জ্যোতিঃ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—তিনি যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হয়।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে দিব্য কর্ণ লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—এই আকাশভূত ও তাহাকে অনুভব করিবার যন্ত্রস্বরূপ কর্ণ রহিয়াছে। ইহাদের উপর সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। তখন তিনি সমুদয় শুনিতে পান।

বহু মাইল দূরে কোন কথাবার্ত্তা বা শব্দ হইলেও তিনি শুনিতে পান।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমা-
ল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ—শরীরের ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্ত-সংযম করিয়া এবং তূলার ন্যায় আপনাকে লঘু ভাবনা করিয়া যোগী আকাশের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা—আকাশই এই শরীরের উপাদান; আকাশই একপ্রকার বিকৃত হইয়া এই শরীররূপ ধারণ করিয়াছে। যদি যোগী শরীরের উপাদান ঐ আকাশ ধাতুর উপর সংযমপ্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হন ও যেথানে ইচ্ছা, বায়ুর মধ্য দিয়া যথায় তথায় যাইতে পারেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ
প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—বাহিরে যে মনের যথার্থ বৃত্তি অর্থাৎ মনের ধারণা, তাহার নাম মহাবিদেহ; তাহার উপর সংযমপ্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাহার ক্ষয় হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—মন অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বিবেচনা করে যে সে এই দেহের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে। যদি মন সর্ব্বব্যাপী হয়, তবে

আমরা কেবলমাত্র এক প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিব, অথবা এই অহংকে একটি শরীরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব কেন? ইহার ত কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগী ইচ্ছা করেন যে তিনি যেখানে ইচ্ছা, তথায় আপনার এই আমিত্ব-ভাবকে অনুভব করিবেন। অহংভাব চলিয়া গিয়া যে মানসিক বৃত্তিপ্রবাহ এই দেহে জাগরিত হয়, তাহাকে 'অকল্পিতা বৃত্তি' বা 'মহাবিদেহ' বলে। যখন তিনি উহার উপর সংযম করিতে কৃতকার্য্য হন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়া যায় এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান চলিয়া গিয়া সমস্তই তাঁহার নিকট চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়।

স্থূলস্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্ব-সংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ—ভূতগণের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ভূতজয় হয়।*

ব্যাখ্যা—যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন; প্রথম স্থূলভূতের উপর, তৎপরে উহার অন্যান্য সূক্ষ্ম অবস্থার উপর সংযম করেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই সংযমটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা খানিকটা কাদার তাল লইয়া উহার উপর সংযম প্রয়োগ করেন, করিয়া ক্রমশঃ উহা যে সকল

* স্বরূপ—পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের তারল্যাদি। অন্বয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেক ভূতে অন্বিত রহিয়াছে, ইহা জানা। অর্থবত্ত্ব—বিশেষ বিশেষ ভোগপ্রদান-সামর্থ্য।

সূক্ষ্মভূতে নির্ম্মিত, তাহা দেখিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহারা ঐ সূক্ষ্মভূতের বিষয় সমুদয় জানিতে পারেন, তখনি তাঁহারা ঐ ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন। সমুদয় ভূতের পক্ষেই ইহা বুঝিতে হইবে—যোগী সমুদয়ই জয় করিতে পারেন।

ততোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্ম্মা-
নভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ—তাহা হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পৎ লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক ধর্ম্মের অনভিঘাত হয়।

ব্যাখ্যা—ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি আপনাকে ইচ্ছামত অণু করিতে পারেন, তিনি আপনাকে খুব বৃহৎ করিতে পারেন, আপনাকে পৃথিবীর ন্যায় গুরু ও বায়ুর ন্যায় লঘু করিতে পারেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহারই উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই জয় করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছায় সিংহ তাঁহার পদতলে মেষের ন্যায় শান্তভাবে বসিয়া থাকিবে ও তাঁহার সমুদয় বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে।

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ—কায়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য্য, সুন্দর অঙ্গ-কান্তি, বল ও বজ্রবৎ দৃঢ়তা বুঝায়।

ব্যাখ্যা—তখন শরীর অবিনাশী হইয়া যায়, কিছুই উহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। যোগী যদি স্বয়ং ইচ্ছা না

করেন, তবে কিছুই তাঁহার বিনাশে সমর্থ হয় না, "কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়া তিনি এই জগতে শরীর লইয়া বাস করেন।" বেদে লিখিত আছে যে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা কোন ক্লেশ হয় না।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ—ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যপদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগদাতৃত্ব এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়।

ব্যাখ্যা—বাহ্য বস্তুর অনুভূতির সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মন হইতে বাহিরে যাইয়া বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই উপলব্ধি ও অস্মিতার উৎপত্তি হয়। যখন যোগী উহাদের উপর এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। যে কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ—যথা একখানি পুস্তক—তাহা লইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। তৎপরে পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান রহিয়াছে তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বারা সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥৪৯॥

সূত্রার্থ—তাহা হইতে দেহের মনের ন্যায় বেগ, ইন্দ্রিয়গণের দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—যেমন ভূতজয় দ্বারা কায়সম্পৎ লাভ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শক্তিসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ—পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের উপর চিত্তসংযম করিলে সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—যখন আমরা প্রকৃতি জয় করিতে পারি ও পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি করিতে পারি, অর্থাৎ জানিতে পারি যে পুরুষ অবিনাশী, পবিত্র ও পূর্ণস্বরূপ, তখন সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫১ ॥

সূত্রার্থ—এইগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—যখন তিনি কৈবল্য লাভ করেন, তখন তিনি মুক্ত হইয়া যান। যখন তিনি সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা শক্তিদ্বয়কেও পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি সমুদয় প্রলোভন, এমন কি দেব-গণকৃত প্রলোভনও অতিক্রম করিতে পারেন। যখন যোগী এই সকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াও উহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি সেই চরম লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? কেবল বিকার মাত্র। স্বপ্ন হইতে

উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কি আছে? সর্ব্বশক্তিমত্তাও স্বপ্নতুল্য। উহা কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মনেরও অতীত প্রদেশে।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং
পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥

সূত্রার্থ—দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওয়া বা আনন্দবোধ করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

ব্যাখ্যা—আরও অনেক বিঘ্ন আছে। দেবাদি যোগীকে প্রলোভিত করিতে আসেন; তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, কেহ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। আমরা যেমন ঈর্ষাপরায়ণ, তাঁহারাও সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের অপেক্ষা অধিক। তাঁহারা পাছে আপনাদের পদভ্রষ্ট হয়, তজ্জন্য অতিশয় ভীত। যে সকল যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, তাঁহারা মৃত হইয়া দেবতা হন। তাঁহারা সোজা পথ ছাড়িয়া পার্শ্বের এক পথে চলিয়া যান ও এই ক্ষমতাগুলি লাভ করেন। তাঁহাদের আবার জন্মাইতে হয়, কিন্তু যিনি এতদূর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোভনগুলি পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারেন ও একেবারে সেই লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিতে পারেন, তিনিই মুক্ত হইয়া যান।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৩ ॥

সূত্রার্থ—ক্ষণ ও তাহার পূর্ব্বাপর ভাবগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তিগুলি হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? বিবেকবলে যখন সদসৎ বিচারশক্তি হয়, তখনই এই সকল বিঘ্ন চলিয়া যাইবে। এই বিবেকজ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সংযমের উপদেশ প্রদত্ত হইল। ক্ষণ অর্থাৎ কালের সূক্ষ্মতম অংশের এবং উহার পূর্ব্বাপর ভাবগুলির উপর সংযমের দ্বারা ইহা হইয়া থাকে।

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৪ ॥

সূত্রার্থ—জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে পার্থক্যনিশ্চয় করিতে না পারার জন্য তুল্য বোধ হয়, তাঁহাদিগকেও ঐ পূর্ব্বোক্ত সংযমের দ্বারা পৃথক্ করিয়া জানা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা—আমরা যে দুঃখভোগ করি, তাহা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যদৃষ্টির অভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা সকলেই মন্দকে ভাল বলিয়া ও স্বপ্নকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। আত্মাই একমাত্র সত্য, আমরা উহা বিস্মৃত হইয়াছি। শরীর মিথ্যা স্বপ্নমাত্র; আমরা ভাবি, আমরা শরীর। সুতরাং দেখা গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কারণ। এই অবিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রসূত হয়। বিবেক আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বলও আসে, তখনই আমরা এই শরীর,

স্বর্গ ও দেবাদির কল্পনা-পরিহারে সমর্থ হই। জাতি, চিহ্ন ও স্থান দ্বারা আমরা বস্তুদিগকে ভিন্ন করিয়া থাকি। উদাহরণস্থলে একটি গাভীর কথা ধরা যাউক। গাভীর কুকুর হইতে ভেদ জাতিগত। দুইটি গাভীর মধ্যে আমরা কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়া থাকি? চিহ্নের দ্বারা। আবার দুইটি বস্তু সর্ব্বাংশে সমান হইলে, আমরা স্থানগত ভেদের দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি। কিন্তু যখন বস্তুসকল এমন মিশাইয়া থাকে যে, ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলির কিছুই কাজে আসে না, তখন পূর্ব্বোক্ত সাধনপ্রণালী-অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ বিবেকবলে আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি। যোগীদিগের উচ্চতম দর্শন এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ধস্বভাব ও সদা পূর্ণস্বরূপ এবং জগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র অমিশ্র বস্তু। শরীর ও মন মিশ্র পদার্থ, তথাপি আমরা সর্ব্বদাই আমাদিগকে উহাদের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছি। এই আমাদের মহাভ্রম যে, এই পার্থক্যটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যখন এই বিবেকশক্তি লব্ধ হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায় যে জগতের সমুদয় বস্তু —তাহা বাহ্যই হউক আর আভ্যন্তরই হউক, সমুদয়ই মিশ্র পদার্থ, সুতরাং উহারা পুরুষ হইতে পারে না।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা-বিষয়মক্রমঞ্চেতি
বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫ ॥

সূত্রার্থ—যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর

সর্ব্ববিধ অবস্থাকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে তারকজ্ঞান বলে।

ব্যাখ্যা—তারক অর্থে যাহা সংসার হইতে তারণ করে। সমুদয় প্রকৃতির সূক্ষ্ম স্থূল সর্ব্ববিধ অবস্থা এই জ্ঞানের গ্রাহ্য। এই জ্ঞানে কোনরূপ ক্রম নাই। ইহা সমুদয় বস্তুকে মুহূর্ত্তমধ্যে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥

সূত্রার্থ—যখন সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, তখনই কৈবল্য লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতে পারা যায়, তখন আত্মা বুঝিতে পারেন যে তিনি চিরকালই একমাত্র—কেবল ছিলেন, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না। যতদিন আমরা আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও চাহি, ততদিন আমরা দাসমাত্র। যখন পুরুষ জানিতে পারেন যে, তিনি মুক্তস্বভাব ও তাঁহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না—জানিতে পারেন যে, এই প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তিলাভ হয়, তখনই এই কৈবল্য লাভ হয়। যখন আত্মা জানিতে পারেন যে, জগতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে দেবগণ পর্য্যন্ত কিছুরই উপর তাঁহার নির্ভরের প্রয়োজন নাই, তখনই আত্মার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পূর্ণতা

বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধি উভয় মিশ্রিত সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষের ন্যায় শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই এই কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে, তখন উহা কেবল নির্গুণ পবিত্রস্বরূপ পুরুষকে প্রতিফলিত করে।

চতুর্থ অধ্যায়

কৈবল্য-পাদ

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—সিদ্ধিসমূহ জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—কখনও কখনও মানুষ পূর্ব্বজন্মলব্ধ সিদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে জন্মে সে যেন তাহাদের ফলভোগ করিতেই আসে। সাংখ্যদর্শনের পিতৃস্বরূপ কপিলসম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। 'সিদ্ধি' এই শব্দের অর্থ—যিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

যোগীরা বলেন, রসায়নবিদ্যা অর্থাৎ ঔষধাদি দ্বারা এই সকল শক্তি লব্ধ হইতে পারে। তোমরা সকলেই জান যে, রসায়নবিদ্যার প্রারম্ভ আলকেমি * হইতে। মানুষ পরশ-পাথর (Philosopher's stone), সঞ্জীবনী অমৃত (Elixir of life)' ইত্যাদির অন্বেষণ করিত। ভারতবর্ষে রসায়ন নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের এই মত ছিল যে, সূক্ষ্ম

* আলকেমি—তামা প্রভৃতি নিম্নদরের ধাতু হইতে সোনা রূপা প্রভৃতি করিবার বিদ্যা। পূর্ব্বে ইউরোপে গুপ্তভাবে এই বিদ্যার খুব চর্চ্চা ছিল। 'সঞ্জীবনী অমৃত' অর্থে এক প্রকার কাল্পনিক রস, যদ্দ্বারা মানব অমর হইতে পারে।

জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম—এ সকলগুলিই সত্য (ভাল) বটে কিন্তু এইগুলিকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় এই শরীর। যদি মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্ন অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে ঐ কারণে সেই চরমলক্ষ্যে পঁহুছিতে কতকটা অধিক সময় লাগিবে। মনে কর কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে অথবা অত্যধিক আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন হইতে ইচ্ছুক। কিন্তু অধিকদূর উন্নতি করিতে না করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন সে আর এক দেহ লইয়া পুনরায় সাধন করিতে আরম্ভ করিল, পরে তাহার মৃত্যু হইল, এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ সময় নষ্ট হইয়া গেল। যদি শরীরকে এতদূব সবল ও নির্দ্দোষ করিতে পারা যায় যে, উহার জন্মমৃত্যু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে। এই কারণে এই রসায়নেরা বলিয়া থাকেন 'প্রথমে শরীরকে সবল কর'। তাঁহারা বলেন যে, শরীরকে অমর করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মনের ভাব এই যে, শরীর গঠন করিবার কর্ত্তা যদি মন হয়, আর ইহা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনন্ত শক্তিপ্রকাশের এক একটি বিশেষ প্রণালীমাত্র, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর বাহির হইতে যথেচ্ছ শক্তিসংগ্রহ করিবার কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং আমরা চিরকাল এই শরীরকে রাখিতে পারিব না কেন? যত শরীর আমরা ধারণ করি, সমুদয়ই আমাদিগকে গঠন করিতে হয়। যে মুহূর্ত্তে এই শরীরের পতন হইবে, তন্মুহূর্ত্তে আবার আমাদিগকে আর

এক শরীর গঠন করিতে হইবে, কেন না যদি আমাদের এই ক্ষমতা থাকে, তবে এই শরীর হইতে বাহিরে না গিয়া, আমরা এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকার্য্য করিতে পারিব। এই মতটি সম্পূর্ণ সত্য। যদি ইহা সম্ভব হয় যে, আমরা মৃত্যুর পরও জীবিত থাকিয়া আপনাদের শরীর গঠন করি, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে শরীরকে ধ্বংস না করিয়া কেবল উহাকে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া এই স্থানেই শরীর প্রস্তুত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব কেন হইবে? তাঁহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, পারদ ও গন্ধকে অত্যদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে। এই দ্রব্যগুলি এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীরকে অবিকৃত রাখিতে পারে। অপর কেহ কেহ বিশ্বাস করিত যে, ঔষধবিশেষের সেবনে আকাশগমনাদি সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য্য ঔষধই, বিশেষতঃ ঔষধে ধাতুর ব্যবহার আমরা রাসায়নিকদের নিকট হইতে পাইয়াছি। কোন কোন যোগিসম্প্রদায় বলেন, আমাদের প্রধান প্রধান গুরুরা অনেকে এখনও তাঁহাদের পুরাতন শরীরে বিদ্যমান আছেন। যোগসম্বন্ধে যাঁহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই পতঞ্জলি ইহা অস্বীকার করেন না।

মন্ত্রশক্তি—মন্ত্রনামক কতকগুলি পবিত্র শব্দ আছে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারণ করিলে উহা হইতে আশ্চর্য্য শক্তিলাভ হইয়া থাকে। আমরা দিনরাত এমন এক মহা অদ্ভুত ঘটনারাশির মধ্যে বাস করিতেছি যে, আমরা সেগুলির বিষয় কিছু ভাবিয়া দেখি না, উহাদিগকে সামান্য জ্ঞান করি।

মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীমা-পরিসীমা নাই।

তপস্যা— তোমরা দেখিবে, কৃচ্ছ্রসাধন প্রত্যেক ধর্ম্মেই আছে। ধর্ম্মের এই সকল অঙ্গ-সাধনের বিষয়ে হিন্দুরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদূর গমন করিয়া থাকেন। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা সমস্ত জীবন হস্ত ঊর্দ্ধে রাখিয়া দিবেন, পরিশেষে উহা শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। অনেকে দিবারাত্র দাঁড়াইয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের পা ফুলিয়া উঠে; যদি তাহারা তাহার পরও জীবিত থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাহাদের পদদেশ এতদূর শক্ত হইয়া যায় যে, তাহারা আর পা নোয়াইতে পারে না। সমস্ত জীবন তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। আমি একবার একটি ঊর্দ্ধবাহু পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যখন আপনি প্রথম প্রথম ইহা অভ্যাস করিতেন, তখন আপনি কিরূপ বোধ করিতেন?" তিনি বলিলেন যে, প্রথম প্রথম ভয়ানক যাতনা বোধ হইত। এত যাতনা বোধ হইত যে, তিনি নদীতে যাইয়া জলে ডুবিয়া থাকিতেন; তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইত। একমাস পরে আর তাঁহার বিশেষ কষ্ট ছিল না। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা বিভূতি লাভ হইয়া থাকে।

সমাধি— ইহাই প্রকৃত যোগ, এই শাস্ত্রের ইহাই প্রধান বিষয়; আর ইহাই সাধনের প্রধান উপায়। পূর্ব্বে যেগুলির বিষয় বলা হইল, উহারা গৌণ সাধন মাত্র। উহাদিগের দ্বারা

সেই পরম পদ লাভ করা যায় না। সমাধিদ্বারা মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাহা কিছু, আমরা সবই লাভ করিতে পারি।

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—পতঞ্জলি বলিয়াছেন, এই শক্তিগুলি জন্মদ্বারা লাভ হয়, কখন কখন ঔষধবিশেষদ্বারা লব্ধ হয়, আর তপস্যা-দ্বারাও ইহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছা রক্ষা করা যাইতে পারে। এক্ষণে এই শরীর একজাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হয় কেন, তাহা বলিতেছেন। তিনি বলেন, 'ইহা প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা হইয়া থাকে।' পরসূত্রে তিনি ইহা ব্যাখ্যা করিবেন।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু
ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—সৎ ও অসৎ কর্ম্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নহে, কিন্তু উহারা উহার বাধাভগ্নকারী নিমিত্তমাত্র—যেমন, কৃষক জল আসিবার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ আইল ভঙ্গ করিয়া দিলে জল আপনার স্বভাবেই চলিয়া যায়।

ব্যাখ্যা—যখন কোনও কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল মধ্যে কপাটের দ্বারা ঐ জল ক্ষেত্রে আসিতে দিতেছে না। কৃষক সেই কপাট খুলিয়া দেয় মাত্র, দিবামাত্রই জল আপনাআপনি মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মানুসারে তাহার ভিতর চলিয়া যায়। এইরূপ সকল ব্যক্তিতে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত রহিয়াছে। পূর্ণতা প্রত্যেক মনুষ্যের স্বভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, উহা উহার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহার সেই স্বভাবগত পূর্ণতা নিজ শক্তিবলে অভিব্যক্ত হইবেই হইবে। তখন মানুষ তাহার ভিতর পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে ও প্রকৃতি আপনার অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমরা যাহাদিকে পাপী বলি, তাহারা সাধুরূপে পরিণত হয়। স্বভাবই আমাদের পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথায় লইয়া যাইবেন। ধার্ম্মিক হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্য্যমাত্র—কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দেওয়া ও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, জন্ম হইতে প্রাপ্ত অধিকারস্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া। আজকাল প্রাচীন যোগীদিগের পরিণামবাদ বর্ত্তমান কালের জ্ঞানের আলোকে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু যোগীদিগের ব্যাখ্যা

আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতর। আধুনিকেরা বলেন, পরিণামের দুইটি কারণ—যৌন-নির্ব্বাচন (Sexual selection) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন (Survival of the fittest)।* কিন্তু এই দুইটি কারণকে সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল যে, শরীর ধারণ ও পতি বা পত্নী লাভ করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহা হইলে আধুনিকদিগের মতে মানবীয় উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে ও জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতের এই ফল দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি আপনার বিবেকের ভৎ'সনা হইতে অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা দার্শনিক নাম ধারণ করিয়া যত দুষ্ট ও অনুপযুক্ত লোকদিগকে মারিয়া ফেলিয়া (অবশ্য ইহারাই উপযুক্ততা অনুপযুক্ততার একমাত্র বিচারক) মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিতে চাহেন। কিন্তু প্রাচীন পরিণামবাদী মহাপুরুষ পতঞ্জলি বলেন যে, পরিণামের প্রকৃত রহস্য—প্রত্যেক ব্যক্তিতে পূর্ণতার যে প্রাগ্‌ভাব রহিয়াছে তাহারই আবির্ভাব মাত্র। ঐ পূর্ণতারূপ আমাদের অন্তরালস্থ অনন্ত তরঙ্গরাশি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতি-

* ডারউইনের মত এই যে, জগতের ক্রমোন্নতি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে হয়, তন্মধ্যে যৌন-নির্ব্বাচন ও যোগ্যতমের উজ্জীবনই প্রধান। সকল জীবই আপনার উপযুক্ত ভর্ত্তা বা ভার্য্যা নির্ব্বাচন করিয়া লয় ও যে যোগ্যতম সেই শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, এই দুই শব্দের এই অর্থ।

দ্বন্দিতা ও প্রতিযোগিতা কেবল আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। আমরা এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে হয়, তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের পশ্চাতে যে অনন্ত তরঙ্গরাশি রহিয়াছে, তাহা আপনাকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ, কেবল জীবনধারণ অথবা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই অভিব্যক্তির কারণ নহে। উহারা বাস্তবিক ক্ষণিক অনাবশ্যক বাহ্য ব্যাপার মাত্র। উহারা অজ্ঞানজাত। সমুদয় প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া যাইলেও যতদিন পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমাদের অন্তরালস্থ এই পূর্ণস্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে। এই জন্যই প্রতিযোগিতা যে উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর মানুষ গূঢ়ভাবে রহিয়াছে। যেমন দ্বার খোলা হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি মানুষ প্রকাশ পায়। এইরূপ মানুষের ভিতরও দেবতা গূঢ়ভাবে রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়া তাঁহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে না। যখন জ্ঞান এই প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশ পান।

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই অনেক চিত্ত সৃজন করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা—কর্ম্মবাদের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা আমাদিগের সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকি আর সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য এই, মানুষের নিজ মহিমা অবগত হওয়া। সমুদয় শাস্ত্রই মানবের আত্মার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মবাদ প্রচার করিতেছে। শুভকর্ম্মের শুভ ফল, অশুভ কর্ম্মের অশুভ ফল হইয়া থাকে। কিন্তু যদি শুভাশুভ আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আত্মা ত কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে অশুভ কর্ম্ম কেবল পুরুষের স্ব-স্বরূপ প্রকাশের বাধা দেয় মাত্র, শুভ কর্ম্ম সেই বাধাগুলি দূর করিয়া দেয়; তখনই পুরুষের মহিমা প্রকাশিত হয়; কিন্তু পুরুষ নিজে কখনই পরিণাম প্রাপ্ত হন না। তুমি যাহাই কর না কেন, কিছুই তোমার মহিমাকে—তোমার নিজ স্বরূপকে নষ্ট করিতে পারে না; কারণ, কোন বস্তুই আত্মার উপর কার্য্য করিতে পারে না, কেবল উহাদ্বারা যেন আত্মার উপর একটি আবরণ পড়িয়া উহার পূর্ণতা আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

যোগিগণ শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মক্ষয় করিবার জন্য কায়ব্যূহ সৃজন করেন। এই সকল দেহের জন্য আবার তাঁহারা তাঁহাদের অস্মিতা বা অহংতত্ত্ব হইতে মনঃসমূহের সৃজন করিয়া থাকেন। এই নির্ম্মিত চিত্তসমূহকে তাঁহাদের মূল চিত্তের সহিত পৃথক্ নির্দ্দেশের জন্য "নির্ম্মাণচিত্ত" বলে।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্ট মনের কার্য্য

নানাপ্রকার, কিন্তু সেই এক আদি মনই তাহাদের সকলগুলির নিয়ন্তা।

ব্যাখ্যা—এই ভিন্ন ভিন্ন মন, যাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য্য করে, তাহাদিগকে নির্ম্মাণচিত্ত ও এই নির্ম্মিত শরীরগুলিকে নির্ম্মাণদেহ বলে। ভূত ও মন ইহারা যেন দুইটি অফুরন্ত ভাণ্ডারগৃহের ন্যায়। যোগী হইলেই তুমি উহাদিগকে জয় করিবার রহস্য অবগত হইবে। তোমার বরাবরই উহা জানা ছিল, কেবল তুমি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলে। যোগী হইলে উহা তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে। তখন তুমি উহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে। যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নির্ম্মিতচিত্তও সেই উপাদান হইতে নির্ম্মিত। মন আর ভূত ইহারা যে পরস্পর পৃথক্ পদার্থ, তাহা নহে, উহারা একই পদার্থের অবস্থাভেদমাত্র। অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সূক্ষ্ম বস্তু, যাহা হইতে যোগীর এই নির্ম্মাণচিত্ত ও নির্ম্মাণদেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং যখনই যোগী প্রকৃতির এই শক্তিগুলির রহস্য অবগত হন, তখনই তিনি অস্মিতা নামক পদার্থ হইতে যত ইচ্ছা তত মন ও শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারেন।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে চিত্ত সমাধিদ্বারা উৎপন্ন, তাহা বাসনাশূন্য।

ব্যাখ্যা—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার

মন দেখিতে পাই, তন্মধ্যে যে মনের সমাধি অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বোচ্চ। যে ব্যক্তি ঔষধ, মন্ত্র অথবা তপস্যাবলে কতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাহার তখনও বাসনা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি যোগের দ্বারা সমাধি লাভ করে, কেবল সেই ব্যক্তিই সকল বাসনা হইতে মুক্ত।

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—যোগীদিগের কর্ম্ম কৃষ্ণও নহে, শুক্লও নহে, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম ত্রিবিধ—অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী এ প্রকার পূর্ণতালাভ করেন, তখন তাঁহার কার্য্য ও ঐ কার্য্যদ্বারা যে কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহাকে আর বন্ধন করিতে পারে না; কারণ, তাঁহার বাসনার সংস্পর্শ নাই। তিনি কেবল কর্ম্ম করিয়া যান। তিনি অপরের হিতের জন্য কর্ম্ম করেন, অপরের উপকার করেন, কিন্তু তিনি তাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না। সুতরাং, উহা তাঁহাতে বর্ত্তিবে না। কিন্তু সাধারণ লোকে, যাহারা এই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পায় নাই, তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম ত্রিবিধ—কৃষ্ণ (অসৎ কার্য্য), শুক্ল (সৎ কার্য্য) ও মিশ্র।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥৮॥

সূত্রার্থ—এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেই অবস্থায়

প্রকাশ হইবার উপযুক্ত। (অপরগুলি সেই সময়ের জন্য স্তিমিতভাবে থাকে।)

ব্যাখ্যা—মনে কর, আমি সৎ, অসৎ ও মিশ্রিত, এই তিন প্রকার কর্ম্মই করিলাম। তৎপরে মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বর্গে দেবতা হইলাম। মনুষ্যদেহের বাসনা আর দেব-দেহের বাসনা একরূপ নহে। দেবশরীর ভোজন, পান কিছুই করে না। তাহা হইলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কর্ম্ম আহার ও পানের বাসনা সৃজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? আমি যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কর্ম্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, বাসনা উপযুক্ত অবস্থা ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত অবস্থা আসিয়াছে, তাহারাই কেবল প্রকাশ পাইবে। অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এই জীবনেই আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মনুষ্যোচিত ও অনেক পাশব বাসনা রহিয়াছে। আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনাগুলিই প্রকাশ পাইবে, কারণ তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। আমি যদি পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব বাসনাগুলিই আসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ইহাতে কি দেখাইতেছে? ইহাতে দেখাইতেছে যে, বাহিরে উপযুক্ত অবস্থা পাইলে বাসনাগুলিকে দমন করা যায়। কেবল যে কর্ম্ম সেই অবস্থার উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, বাহিরের অনুকূল অবস্থা কর্ম্মকেও দমন করিতে পারে।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং
স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি দেশ ও কাল ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্তর্য্য হইবে।

ব্যাখ্যা—অনুভূতি সমুদয় সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়া সংস্কাররূপে পরিণত হয়, সেগুলি আবার যখন জাগরিত হয়, তখন তাহাকেই স্মৃতি বলে। এস্থলে স্মৃতিশব্দে বর্ত্তমান জ্ঞানকৃত কর্ম্মের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পূর্ব্বানুভূতিসমূহের পরস্পর অজ্ঞানসহকৃত সম্বন্ধকেও বুঝাইবে। প্রত্যেক দেহে, তজ্জাতীয় দেহে লব্ধ যে সকল সংস্কারসমষ্টি, তাহারাই কেবল সেই দেহে কর্ম্মের কারণ হইবে। ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্কার তখন স্তিমিতভাবে থাকিবে। প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় কতকগুলি শরীরের ভবিষ্যৎবংশীয়রূপে কার্য্য করিবে। এইরূপে বাসনার পৌর্ব্বাপর্য্য নষ্ট হয় না।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—সুখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি।

ব্যাখ্যা—আমরা যাহা কিছু অনুভব বা ভোগ করি, তাহাই সুখী হইবার ইচ্ছা হইতে প্রসূত হয়। এই ভোগের কোন আদি নাই; কারণ, প্রত্যেক নূতন ভোগই, পূর্ব্বভোগের দ্বারা আমাদের চিত্তে যে একপ্রকার গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই উপর স্থাপিত। এই কারণে বাসনা অনাদি।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার বিষয় এইগুলি দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া ইহাদের অভাব হইলে বাসনারও অভাব হয়।

ব্যাখ্যা—এই বাসনাগুলি কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত; মনে কোন বাসনা উদিত হইলে উহা তাহার ফলপ্রসব না করিয়া বিনষ্ট হইবে না। আবার মন সমুদয় প্রাচীন বাসনাসমূহের আধার—বৃহৎ ভাণ্ডারস্বরূপ। ঐ বাসনাসমূহ সংস্কারের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহারা যতক্ষণ না উহাদের কার্য্য শেষ করিতেছে, ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই। আরও, যতদিন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তু গ্রহণ করিবে, ততদিন নূতন নূতন বাসনা উত্থিত হইবে।' যদি এইগুলি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, তবেই কেবল বাসনার বিনাশ হইতে পারে।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥১২॥

সূত্রার্থ—বস্তুর ধর্ম্মসকল বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াই সমুদয় হইয়াছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ বাস্তবিক স্বরূপতঃ আছে।

তে ব্যক্ত-সূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—উহারা কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা সূক্ষ্ম

অবস্থায় চলিয়া যায়, আর গুণই উহাদের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—গুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন পদার্থকে বুঝায়, উহাদের স্থূল অবস্থাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। ভূত ও ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হয়।

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়া বস্তু বাস্তবিক এক। (যদিও বস্তু তিনটি, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, তথাপি তাহার পরিণামগুলির ভিতরে পরস্পর একটি সম্বন্ধ থাকাতে সকল বস্তুতেই একত্ব আছে, বুঝিতে হইবে।)

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—বস্তু এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা ও অনুভূতি হইয়া থাকে।

[ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—(দৃশ্য) বস্তু একটি মাত্র চিত্তের অধীন নয়, (কেন না) তাহা হইলে যখন উহা (সেই চিত্তের) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় হইবে, তখন ঐ বস্তু কি হইবে?]

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের অপেক্ষা থাকাতে বস্তু কখন জ্ঞাত ও কখন অজ্ঞাত থাকে।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ
পুরুষস্যাঽপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—চিত্তবৃত্তিগুলিকে সর্ব্বদাই জানা যায়, কারণ, উহাদের প্রভু পুরুষ অপরিণামী।

ব্যাখ্যা—এতক্ষণ ধরিয়া যে মতের কথা বলা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, জগৎ মনোময় ও ভৌতিক এই উভয় প্রকারই। আর এই মনোময় ও ভৌতিক জগৎ সর্ব্বদাই যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। এই পুস্তকখানি কি? ইহা নিত্যপরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। কতকগুলি বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আসিতেছে, উহা একটি আবর্ত্তস্বরূপ। কিন্তু কথা এই, তাহা হইলে একত্ববোধ কোথা হইতে হইতেছে? এই পুস্তকখানি যে একখানি পুস্তক, তাহা কি করিয়া জানা যাইতেছে? এই পরিণামগুলি তালে তালে হইতেছে; তালে তালে উহারা আমার মনে তাহাদের প্রভাব প্রেরণ করিতেছে। যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদা পরিবর্ত্তনশীল, তথাপি উহারাই একত্র হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে। মনও এইরূপ সদা পরিবর্ত্তনশীল। মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে ভ্রমণশীল একই পদার্থের দুইটি স্তর মাত্র। তুলনায় একটী মৃদু ও অপরটি দ্রুততর বলিয়া অবশ্য আমরা ঐ দুইটি গতির মধ্যে অনায়াসে

পার্থক্য করিতে পারি। যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে ও একখানি গাড়ী তাহার পাশ দিয়া যাইতেছে। কিয়ৎ পরিমাণে এই উভয়েরই গতি নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি অপর একটি পদার্থের প্রয়োজন। নিশ্চল বস্তু একটি থাকিলেই গতিকে অনুভব করা যাইতে পারে। তবে যখন দুই তিনটি বস্তুই বিভিন্নরূপ গতিশীল হয়, তখন আমরা প্রথমে দ্রুততরটির, পরিশেষে মৃদুতর চলনশীল বস্তুটির গতি অনুভব করিতে পারি। মন কি করিয়া অনুভব করিবে? উহা নিয়ত গতিশীল। সুতরাং অপর এক বস্তু থাকা প্রয়োজন, যাহা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে গতিশীল, পরে তদপেক্ষা মৃদুতর, তদপেক্ষা মৃদুতর এইরূপ চলিতে চলিতে আর ইহার অন্ত পাওয়া যাইবে না। সুতরাং যুক্তি তোমায় একস্থানে চুপ করিতে বাধ্য করিবে। অপরিবর্ত্তনীয় কোন বস্তুকে জানিয়া তোমাকে, এই অনন্ত শ্রেণীর শেষ করিতে হইবেই হইবে। এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অসঙ্গ, শুদ্ধস্বরূপ পুরুষ রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লণ্ঠন হইতে আলোক-কিরণরাশি আসিয়া শ্বেত বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া উহাতে শত শত চিত্র উৎপাদন করে অথচ কোনরূপেই উহাকে কলঙ্কিত করে না, ঠিক সেই ভাবেই বিষয়ানুভূতিজ সংস্কারসমূহ কেবল উহার উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—মন দৃশ্য বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ নহে।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতির সর্ব্বত্রই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে,

কিন্তু উহা স্বপ্রকাশ নহে, স্বভাবতঃ চৈতন্যস্বরূপ নহে। কেবল পুরুষই স্বপ্রকাশ, উঁহার জ্যোতিঃতেই প্রত্যেক বস্তু উদ্ভাসিত হইতেছে। উঁহারই শক্তি ভূত ও শক্তিসমুদয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—এক সময়ে দুইটি বস্তুকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নহে।

ব্যাখ্যা—যদি মন স্বপ্রকাশ হইত, তবে এক সময়ে উহা সমুদয় অনুভব করিতে পারিত; উহা ত তাহা পারে না। যদি এক বস্তুতে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর অপর বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারিবে না। যদি মন স্বপ্রকাশ হইত, তবে উহা কত অনুভূতি যে এক সঙ্গে করিতে পারিত, তাহার সীমা নাই। পুরুষ এক মুহূর্তে সমুদয় অনুভব করিতে পারেন, সুতরাং পুরুষ স্বপ্রকাশ।*

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ
স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—যদি কল্পনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত ঐ চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার অন্ত থাকিবে না ও স্মৃতির গোলমাল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা—মনে কর, আর এক মন রহিয়াছে, উহা ঐ প্রথম মনটিকে অনুভব করিতেছে, তাহা হইলে আবার এমন

* এই সূত্রের টীকা-সম্মত অর্থ এই,—মন এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে অনুভব করিতে পারে না বলিয়া উহা স্বপ্রকাশ নহে, পুরুষই স্বপ্রকাশ।

এক মনের আবশ্যক, যাহা আবার তাহাকে অনুভব করিবে, সুতরাং, ইহার কোন স্থানে শেষ পাওয়া যাইবে না। ইহাতে স্মৃতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ, স্মৃতির কোন নির্দ্দিষ্ট ভাণ্ডার থাকিবে না।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ
স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—চিৎ অপরিণামী ; যখন মন উহার আকার গ্রহণ করে, তখনই উহা জ্ঞানময় হয়।

ব্যাখ্যা—জ্ঞান যে পুরুষের গুণ নহে, ইহা আমাদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি এই কথা বলিলেন। যখন মন পুরুষের নিকট আইসে, তখন যেন পুরুষ মনের উপর প্রতিফলিত হন আর মন কিয়ৎক্ষণের জন্য জ্ঞানবান হয়, আর বোধ হয় যেন উহাই পুরুষ।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—যখন মন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত হয়, তখন উহা সর্ব্বপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে।

ব্যাখ্যা—একদিকে দৃশ্য অর্থাৎ বাহ্য জগৎ মনের উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অপর দিকে দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছে ; ইহা হইতেই মনে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আইসে।

তদসংখ্যেয়-বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং
সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—সেই মন অসংখ্য বাসনাদ্বারা বিচিত্র হইলেও মিশ্র পদার্থ বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কার্য্য করে।

ব্যাখ্যা—মন নানাপ্রকার পদার্থের সমষ্টিস্বরূপ; সুতরাং উহা নিজের জন্য কার্য্য করিতে পারে না। এই জগতে যত মিশ্র পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর বস্তুতে—এমন কোন তৃতীয় বস্তুতে—যাহার জন্য সেই পদার্থ এইরূপে মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং, মনও যে নানাপ্রকার বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা কেবল পুরুষের জন্য।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—বিশেষদর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের মনে আত্মভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নহেন।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভাবং * চিত্তম্ ॥২৬॥

সূত্রার্থ—তখন চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের পূর্ব্বলক্ষণ লাভ করে।

ব্যাখ্যা—এইরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হইয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়া যায়, আমরা তখন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, উহা

* পাঠান্তর—কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং

সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের জন্য এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে মাত্র। আমরা তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি ঈশ্বর নহেন। এই প্রকৃতির সমুদয় সংহতিই কেবল আমাদের হৃদয়সিংহাসনস্থ রাজা পুরুষকেই এই সমস্ত দৃশ্য দেখাইবার জন্য। যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা বিবেকের উদয় হয়, তখন ভয় চলিয়া যায় ও কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—উহার বিঘ্নস্বরূপে যে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সংস্কার হইতে আসিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—'আমাকে সুখী করিবার জন্য কোন বাহিরের বস্তু আবশ্যক', এইরূপ বিশ্বাস আমাদের যে সকল ভাব হইতে আইসে, তাহারা সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক। পুরুষ স্বভাবতঃ সুখ ও আনন্দস্বরূপ। পূর্ব্ব সংস্কারের দ্বারা সেই জ্ঞান আবৃত হইয়াছে। এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়া আবশ্যক।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা নাশের কথা বলা হইয়াছে, ইহাদিগকেও ঠিক সেই উপায়েই নাশ করিতে হইবে।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথাবিবেকখ্যাতে-
ধর্ম্মমেঘ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—তত্ত্বসমূহের বিবেকজ্ঞানজনিত ঐশ্বর্য্যেও যিনি বীতস্পৃহ হন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে বিবেকজ্ঞান

লাভ হয় বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মমেঘনামক সমাধি লাভ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আসিবে, কিন্তু প্রকৃত যোগী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট ধর্ম্মমেঘ-নামক এক বিশেষপ্রকার জ্ঞান, এক বিশেষপ্রকার আলোক আইসে। ইতিহাস যে সকল ধর্ম্মাচার্য্যদিগের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই ধর্ম্মমেঘসমাধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের ভিতরেই জ্ঞানের মূল প্রস্রবণ পাইয়া-ছিলেন। সত্য তাঁহাদের নিকট অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শক্তিসমূহের অভিমান ত্যাগ করাতে শান্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রতা তাঁহাদের স্বভাবগত হইয়া গিয়াছিল।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—যখন এই ধর্ম্মমেঘসমাধি আইসে, তখন আর পতনের আশঙ্কা নাই, কিছুতেই আর তাঁহাকে অধোদিকে আকর্ষণ করিতে পারে না, আর তাঁহার কোন কষ্টও থাকে না।

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্-
জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—তখন জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার আবরণ ও

অশুদ্ধিশূন্য হওয়ায় অনন্ত হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা—জ্ঞান ত ভিতরে রহিয়াছে, কেবল উহার আবরণ চলিয়া যায় মাত্র। কোন বৌদ্ধশাস্ত্র 'বুদ্ধ' (ইহা একটি অবস্থার সূচক) শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন—অনন্ত আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান। যীশু ঐ অবস্থা লাভ করিয়া খ্রীষ্ট হইয়াছিলেন। তোমরা সকলেই ঐ অবস্থা লাভ করিবে। তখন জ্ঞান অনন্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া যাইবে। এই সমুদয় জগৎ উহার সর্ব্বপ্রকার জ্ঞেয় বস্তুর সহিত পুরুষের নিকট শূন্যরূপে প্রতিভাত হইবে। সাধারণ লোকে আপনাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে, কারণ, তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত বলিয়া বোধ হয়।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥৩২॥

সূত্রার্থ—যখন গুণগুলির কার্য্য শেষ হইয়া যায়, তখন গুণগুলির যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাহাও শেষ হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—তখন গুণগুলির এই সকল বিভিন্ন পরিণাম, এক জাতি হইতে উহাদের অপর জাতিতে পরিণতি, একেবারে শেষ হইয়া যায়।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥৩৩॥

সূত্রার্থ—যে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহূর্ত্তসম্বন্ধ

লইয়া অবস্থিত ও যাহাকে একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে (শেষে) যাইয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম ক্রম।

ব্যাখ্যা—পতঞ্জলি এখানে ক্রম শব্দের লক্ষণ করিলেন। ক্রম শব্দে যে পরিণামগুলি মুহূর্ত্তকাল সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, ইহার মধ্যে কত মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল। এই প্রতি মুহূর্ত্তের সহিতই ভাবের পরিবর্ত্তন, কিন্তু আমরা ঐ পরিণামগুলিকে একটি শ্রেণীর অন্তে (অর্থাৎ অনেক পরিণামশ্রেণীর পর) ধরিতে পারি। ইহাকে ক্রম বলে। কিন্তু যে মন সর্ব্বব্যাপী হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর ক্রম নাই। তাহার পক্ষে সবই বর্ত্তমান হইয়া গিয়াছে। কেবল এই বর্ত্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তখন সে মন কালকে জয় করে আর তাহার নিকট সমুদয় জ্ঞানই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমুদয়ই তাহার নিকট বিদ্যুতের ন্যায় চকিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ
কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥৩৪॥

সূত্রার্থ—গুণসকলে যখন পুরুষের কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে কৈবল্য বলে, অথবা উহাকে চিৎশক্তির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতির কার্য্য ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কার্য্য নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ অপহৃত মহিমা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন। গিয়া, যাহারা এই জীবনের পথচিহ্নবিহীন মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের মধ্য দিয়া অনন্ত নদীস্বরূপ জীবাত্মাগণ সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন।

যাঁহারা আপনাদের স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের জয় হউক। তাঁহারা আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পরিশিষ্ট

যোগ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রের মত

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

দ্বিতীয় অধ্যায়

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ॥ ৬॥

অর্থ—যেখানে অগ্নিকে মথন করা হয়, যেখানে বায়ুকে রোধ করা হয় ও যেখানে অপর্য্যাপ্ত সোমরস প্রবাহিত হয়, সেখানে (সিদ্ধ) মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ শ্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥ ৮॥

অর্থ—বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে স্থাপন করিয়া জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলাদ্বারা সমুদয় ভয়াবহ স্রোত পার হইয়া যান।

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥ ৯॥

অর্থ—সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে সংযম করেন। যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখন নাসিকা দ্বারা প্রশ্বাস পরিত্যাগ

করেন। যেমন সারথি চঞ্চল অশ্বগণকে ধারণ করেন, অধ্যবসায়শীল যোগীও তদ্রূপ মনকে ধারণ করিবেন।

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

অর্থ—সমতল, শুচি, প্রস্তর, অগ্নি ও বালুকাশূন্য, মনুষ্যকৃত অথবা কোন জলপ্রপাতজনিত মনশ্চাঞ্চল্যকর শব্দশূন্য, মনের অনুকূল, চক্ষুর প্রীতিকর, পর্ব্বতগুহাদি নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া, যোগ অভ্যাস করিতে হইবে।

নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥

অর্থ—নীহার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোৎ, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, চন্দ্র, এই রূপগুলি সম্মুখে আসিয়া ক্রমশঃ যোগে ব্রহ্মকে অভিব্যক্ত করে।

পৃথ্ব্যপতেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ ১২ ॥

অর্থ—যখন পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে যৌগিক অনুভূতি সমুদয় হইতে থাকে তখন যোগ আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ যোগাগ্নিময় শরীর পাইয়াছেন, তাঁহার আর ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে না।

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

অর্থ—শরীরের লঘুতা, স্বাস্থ্য, লোভশূন্যতা, সুন্দর বর্ণ, স্বর-সৌন্দর্য্য, মূত্রপুরীষের অল্পতা ও শরীরে একটি পরম

সুগন্ধ, যোগারম্ভ করিলে যোগীর এই লক্ষণগুলি প্রথমেই প্রকাশ পায়।

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তং।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—যেমন সুবর্ণ ও রজত প্রথমে মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত থাকে, পরিশেষে উত্তমরূপে ধৌত হইয়া তেজোময় হইয়া প্রকাশ পায় সেইরূপ দেহী আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া একস্বরূপ, কৃতার্থ ও দুঃখবিমুক্ত হয়।

শঙ্কর-উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য

আসনানি সমভ্যস্য বাঞ্ছিতানি যথাবিধি।
প্রাণায়ামং ততো গার্গি, জিতাসনগতোঽভ্যসেৎ ॥
মৃদ্বাসনে কুশান্সম্যগাস্তীর্য্যাজিনমেব চ
লম্বোদরং চ সম্পূজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ ॥
তদাসনে সুখাসীনঃ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্।
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক্ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ ॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।
অতিভুক্তমভুক্তং চ বর্জ্জয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥
নাড়ীসংশোধনং কুর্য্যাদুক্তমার্গেণ যত্নতঃ।
বৃথা ক্লেশো ভবেত্তস্য তচ্ছোধনমকুর্ব্বতঃ ॥
নাসাগ্রে শশভৃদ্বীজং চন্দ্রাতপবিতানিতম্।
সপ্তমস্য তু বর্গস্য চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্ ॥

বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উভে।
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং বাহ্যং দ্বাদশমাত্রকৈঃ ॥
ততোঽগ্নিং পূর্ব্ববদ্ধ্যায়েৎ স্ফুরজ্জ্বালাবলীযুতম্।
কৃষষ্ঠং বিন্দুসংযুক্তং শিখিমণ্ডলসংস্থিতম্ ॥
ধ্যায়েদ্বিরেচয়েদ্বায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য ঘ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ ॥
তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ।
ত্রিচতুর্ব্বৎসরং চাপি ত্রিচতুর্মাসমেব বা ॥
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্যেবং সমভ্যসেৎ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়ং স্নাত্বা ষট্কৃত্ব আচরেৎ ॥
সন্ধ্যাদিকর্ম্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেঽপি নিত্যশঃ।
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি তচ্চিহ্নং দৃশ্যতে পৃথক্ ॥
শরীরলঘুতা দীপ্তির্জ্জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিসূচকম্ ॥

* * *

প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাদ্রেচকপূরককুম্ভকৈঃ।
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

পূরয়েৎ ষোড়শৈর্মাত্রৈরাপাদতলমস্তকম্।
মাত্রৈর্দ্বাত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্রেচয়েৎ সুসমাহিতঃ
সম্পূর্ণকুম্ভবদ্বায়োর্নিশ্চলং মূর্দ্ধি দেশতঃ।
কুম্ভকং ধারণং গার্গি, চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া

ঋষয়স্তু বদন্ত্যন্যে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
পবিত্রীভূতাঃ পূতাত্মাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ॥
তত্রাদৌ কুম্ভকং কৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
রেচয়েৎ ষোড়শৈর্মাত্রৈর্ন্যাসেনৈকেন সুন্দরি॥
তয়োশ্চ পূরয়েদ্বায়ুং শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া।

* * *

প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষাম্।
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গং ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥

ব্যাখ্যা—যথাবিধি বাঞ্ছিত আসন অভ্যাস করিয়া, অতঃপর, হে গার্গি, জিতাসনগত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। কোমল আসনে কুশ সম্যক্ বিছাইয়া, তাহার উপর মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া, ফল ও মোদকের দ্বারা গণেশের পূজা করিয়া, সেই আসনে সুখাসীন হইয়া বামহস্তে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া, সম-গ্রীবশির হইয়া, মুখ বন্ধ করিয়া, নিশ্চল হইয়া, পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে বসিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, যত্নপূর্ব্বক অতিভোজন বা একেবারে অনাহার ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে যত্নপূর্ব্বক নাড়ী সংশোধন করিবে; এই নাড়ী শোধন না করিলে তাহার সাধনের ক্লেশ সমস্তই বৃথা হয়। পিঙ্গলা ও ইড়ার সংযোগস্থলে (দক্ষিণ ও বাম নাসিকার সংযোগস্থলে) হুং বীজ চিন্তা করিয়া ইড়াকে দ্বাদশমাত্রা বাহ্য বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিবে, তৎপরে সেই স্থানে অগ্নির চিন্তা ও রং বীজ ধ্যান করিবে; এইরূপে ধ্যান করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্গলা (দক্ষিণ নাসিকা) দিয়া বায়ু রেচন করিবে। পুনরায় পিঙ্গলার

দ্বারা পূরক করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধীরে ধীরে ইড়া দ্বারা রেচন করিবে। গুরূপদেশানুসারে ইহা তিন চারি বৎসর অথবা তিন চারি মাস অভ্যাস করিবে। ঊষাকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও মধ্যরাত্রে, যত দিন না নাড়ীশুদ্ধি হয়, ততদিন গোপনে অভ্যাস করিতে হইবে; তখন তাঁহাতে এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয় যথা, শরীরের লঘুতা, সুন্দরবর্ণ, ক্ষুধা ও নাদ-শ্রবণ। তৎপরে রেচক, কুম্ভক, পূরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে হইবে। অপানের সহিত প্রাণ যোগ করার নাম প্রাণায়াম। ১৬ মাত্রায় মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত পূরক, ৩২ মাত্রায় রেচক ও ৬৪ মাত্রায় কুম্ভক করিবে।

আর একপ্রকার প্রাণায়াম আছে, তাহাতে প্রথমে ৬৪ মাত্রায় কুম্ভক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও তৎপরে ১৬ মাত্রায় পূরক করিতে হইবে। প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। ধারণা দ্বারা মনের অপবিত্রতা দূর হয়, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ নাশ হয় ও ধ্যানের দ্বারা, যাহা কিছু আত্মার ঈশ্বরভাব আবরণ করিয়া রাখে, তাহা নাশ হইয়া যায়।

সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র

তৃতীয় অধ্যায়

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্ব্বংপ্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—প্রগাঢ় ধ্যানবলে, শুদ্ধস্বরূপ পুরুষের প্রকৃতিতুল্য সমুদয় শক্তি আসিয়া থাকে।

রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—আসক্তির নাশকে ধ্যান বলে।

বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—সমুদয় বৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয়।

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—ধারণা, আসন ও নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদনের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়।

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—শ্বাসের ছর্দ্দি (ত্যাগ) ও বিধারণ (ধারণ) দ্বারা প্রাণবায়ুর নিরোধ হয়।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—যে ভাবে বসিলে স্থৈর্য্য ও সুখ লাভ হয়, তাহার নাম আসন।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারাও।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ ॥

সূত্রার্থ—প্রকৃতির প্রত্যেক তত্ত্বকে ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ বলিয়া ত্যাগ করিতে পারিলে বিবেক সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে, সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আবশ্যক।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—যেমন শ্যেনপক্ষী মাংসের বিয়োগে দুঃখী ও স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগে সুখী হয় (তদ্রূপ সাধু ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগ করিয়া সুখী হইবেন)।

অহিনির্ল্বয়নীবৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—যেমন সর্পসকল হেয়জ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক্ অনায়াসে পরিত্যাগ করে।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—যাহা বিবেকজ্ঞানের সাধন নহে, তাহার চিন্তা করিবে না, কারণ উহা বন্ধনের হেতু; দৃষ্টান্ত ভরত রাজা।

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—বহু ব্যক্তির সঙ্গ রাগাদির কারণ বলিয়া ধ্যানের বিঘ্নস্বরূপ; দৃষ্টান্ত কুমারী শঙ্খ।

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—দুই জন লোক একসঙ্গে থাকিলেও এইরূপ।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—আশা ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা।

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ যদিও বহুশাস্ত্র ও বহুগুরুর উপাসনা করা হয়, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে সারটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে।

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—শরনির্ম্মাতার ন্যায় একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় না।

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—লৌকিক বিষয়ে যেমন কৃতনিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহা অনর্থের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ইহাতেও।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্ব্বহুকালাত্তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—প্রণতি, ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুসেবাদ্বারা ইন্দ্রের ন্যায়, বহুকালে সিদ্ধি লাভ হয়।

ন কালনিয়মো বামদেববৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই। যেমন, বামদেব মুনির (গর্ভাবস্থায় জ্ঞানোদয়) হইয়াছিল।

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গদ্বারাও বিবেক লাভ হইয়া থাকে।

ন ভোগাৎ রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—যেমন ভোগে সৌভরিমুনির আসক্তির শান্তি হয় নাই, তেমনি অন্যেরও ভোগে রাগশান্তি হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥

সূত্রার্থ—ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্যসিদ্ধি হয় বলিয়া যেমন লোকে ঔষধাদির শক্তি অস্বীকার করে না, তদ্রূপ যোগজ সিদ্ধিও অস্বীকার করিলে চলিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শরীর ও মন বিচলিত না হয় ও সুখকর হয়, এরূপভাবে উপবেশনের নামই আসন।

ব্যাসসূত্র

৪র্থ অধ্যায়—১ম পাদ

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

অর্থ—উপাসনা বসিয়াই সম্ভব, সুতরাং, বসিয়া উপাসনা করিবে।

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

অর্থ—ধ্যান-হেতুও (উপবিষ্ট, অঙ্গচেষ্টারাহিত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে দেখিয়া লোকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব ধ্যান উপবিষ্ট পুরুষেই সম্ভব)।

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

অর্থ—কারণ, ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

অর্থ—কারণ, স্মৃতিতেও এই কথা বলিয়া থাকেন।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

অর্থ—যেখানে একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে বসিয়াই ধ্যান করিবে, কারণ, কোন্ স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতে হইবে, তাহার কোন বিশেষ বিধান নাই।

এই কয়েকটি উদ্ধৃত অংশ দেখিলেই ভারতীয় অন্যান্য দর্শন যোগসম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানা যাইবে।